# বিজ্ঞাপন।

যজ্ঞকথার প্রবন্ধগুলি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত ডাক্তার সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুরোধে রচিত ও বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে পঠিত হইয়াছিল, এবং পরে "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার জীবদ্দশায় এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি জীবিত থাকিলে এই সকল প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিতেন কি না বলিতে পারি না। প্রত্যেক প্রবন্ধে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশের নহে, অন্যদেশের সাহিত্যেও তাহা বিরল। বৈদিক যজ্ঞসমূহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি যে এমন সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না; কাজেই ইহাতে কলম চালাইবার ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের নাই। আমি রচকের সমস্ত কথা অবিকল মুদ্রিত করাইবার ভার লইয়াছিলাম এবং তাহাই সম্পন্ন করিয়া পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কলিকাতা,<br>
১০ই ভাদ্র, ১৩২৭

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

---

# সূচীপত্র।



---

# যজ্ঞ-কথা

## যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র

যজ্ঞের কথা বলিতে চাহি ; আপনারা অবধান করুন।

আমাদের যে সমাজের চলিত নাম হিন্দু-সমাজ, আমি সেই সমাজকে বেদপন্থী সমাজ বলিব। এই সমাজ বেদের শাসন মানে এবং বেদের আনুগত্য স্বীকার করে। বেদপন্থী সমাজের প্রধান অনুষ্ঠানই যজ্ঞানুষ্ঠান। এই যজ্ঞানুষ্ঠানেই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা হইবে না। আমি কয়েকটি প্রবন্ধে সেই তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই বেদপন্থী সমাজে একটু সঙ্কীর্ণতা আছে। গোড়ায় সেটুকু মানিয়া লইব। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আর্য্যজাতির এক শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই সমাজ তন্ত্রের নিজস্ব সাহিত্যই ছিল বেদ। সেই সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান বেদের বিধি-নিষেধ অনুসারেই সম্পাদিত হইত। ভারত-বর্ষের যে সকল আদিম অনার্য্য অধিবাসী ছিল, তাহারা সকলে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পায় নাই। কেহ কেহ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খাঁটি বেদপন্থী আর্য্যেরাই আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন ; আর যে সকল অনার্য্য তাঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে শূদ্র বলা হইত। ফলে, শূদ্রেরা বেদপন্থী সমাজের

আশ্রিত হইলেও ঐ সমাজের সকল অধিকার পায় নাই। খাঁটি বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হয়। আচার-ভেদে এবং বৃত্তিভেদে এই বিভাগের কল্পনা হইয়াছিল। আমি এটাকে একটা থিয়োরি মাত্র মনে করি। বস্তুতই যে এই তিনটা বর্ণের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট রেখা টানা ছিল, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে। বৃত্তিভেদ এবং আচার-ভেদ এখন যেমন নানারূপ আছে, তখনও হয়ত নানারূপ ছিল। তবে থিয়োরির খাতিরে দ্বিজাতি-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটা না একটা বর্ণের কোঠায় ফেলা হইত। পরবর্ত্তী কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ তিনটি মূল বর্ণকে পরস্পর মিশাইয়া নানা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বুঝাইবার একটা উৎকট চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টাও আমার অনুমান কতটা সমর্থন করিতে পারে। সে যাহাই হউক, বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি-সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে, পাইত না। একবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব স্বীকারের জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্বলাভের জন্য ব্যাকুল। তৎসত্বেও বলিতে পারা যায়, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দ্বিজাতি-সমাজ অন্যান্য সমাজ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রহিয়াছে। বেদে অধিকার লইয়াই এই স্বাতন্ত্র্য। যে ব্যক্তি দ্বিজ, সে যে বর্ণের লোকই হউক না, বেদের আলোচনায় এবং বেদবিহিত কর্ম্মে তাহার যোল আনা অধিকার

আছে। যাহারা গোড়া হইতে শূদ্র বলিয়া গণ্য আছে, অথবা দ্বিজত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব লইয়াছে, তাহারা এখন বেদপন্থী সমাজের অন্তর্গত থাকিলেও বেদের আলোচনায় এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ষোল আনা অধিকার পায় নাই।

এখন এই দ্বিজ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যা'ক্।

আজকাল বিদ্যার্জ্জনের নামান্তর—লেখা পড়া শেখা। এ কালে প্রচুর পরিমাণে কালি কলম খরচ করিয়া লেখা অভ্যাস করিতে হয় এবং পুঁথি-পত্রের সাহায্যে পড়া অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলে তবে বিদ্যা লাভ হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। অতএব তখন লেখাও ছিল না, পড়াও ছিল না। লেখা পড়া ছিল না, কিন্তু বিদ্যা ছিল। বিদ্যালাভের জন্য লেখা এবং পড়া একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Science বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। লেখা পড়া ব্যতীতও বিদ্যালাভ হইতে পারে। ভারতবর্ষেও এক সময়ে বিদ্যা ছিল এবং বিদ্যা অর্জ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। বেদপন্থী সমাজের সেই অতি প্রাচীন বিদ্যার নামই বেদ। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সেই অতিপ্রাচীন বেদবিদ্যা হইতেই এ দেশের প্রায় যাবতীয় বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিজাতি-সমাজের প্রত্যেক বালককে এক সময়ে সেই বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ অর্জ্জন করিতে হইত। প্রত্যেক বালককে এই জন্য বিদ্যাদাতা আচার্য্যের সমীপে যাইতে হইত। আচার্য্যের সমীপে যাওয়ার নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন-ব্যাপার এ কালের পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার অনুরূপ। কয়েক বৎসর আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিয়া আচার্য্যদত্ত বেদ-বিদ্যা গ্রহণ করিয়া আচা-র্য্যের অনুমতি লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। এই বাড়ী ফেরার নাম সমাবর্ত্তন। এই সমাবর্ত্তন-ব্যাপার কতকটা এ কালের পাশের সার্টিফিকেট

লইয়া বাড়ী ফেরার অনুরূপ। এই সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়-দত্ত সার্টিফিকেট পাওয়ার পর, গৃহী হইবার অধিকার জন্মিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এ সম্বন্ধেও একটা থিয়োরি খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখনকার বেদবাক্যের নামান্তর ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বেদবাক্য। আচার্য্যগৃহে যিনি বেদের আলোচনা করিতেন, তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী যে সকল আচার-নিয়ম পালন করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। যে সকল ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, বেদের আলোচনা ছাড়িতে চাহিতেন না, তাঁহারা হয়ত গৃহী হইতেন না; যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য লইয়াই কাটাইতেন। আবার কোনও কোনও ছাত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের চর্চ্চায় এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, যে গৃহধর্ম্মে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিত। তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতেন—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। এই আজীবন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্রই সমাবর্ত্তনের পর গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ হইতেন। এই গৃহস্থদিগের সমষ্টি লইয়াই সমাজ। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্ম করে না, লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া চিরকাল বিদ্যাচর্চ্চা অথবা জ্ঞানচর্চ্চা লইয়া জীবন কাটায়, সে সমাজের কেহ নহে। সমাজ তাহাকে পালন করে বটে, রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে সামাজিক নহে।

সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার জন্মে। বিবাহ না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না। যে বিবাহ করে নাই, তাহার গৃহ নাই। মনে রাখিবেন, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' এই বিবাহানুষ্ঠানটা কৃত্রিম অনুষ্ঠান। Malthus সাহেবের Population ঘটিত প্রবন্ধ-প্রচার হইতে বিবাহানুষ্ঠানের ঔচিত্য লইয়া অনেক জল্পনা হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দরিদ্রের পক্ষে বিবাহ অধর্ম্ম; আইনের জোরে তাহাদের বিবাহ বন্ধ করা উচিত। এখনও একশ বৎসর অতিক্রম হয় নাই, ইহারাই মধ্যে কিন্তু হাওয়া ফিরিয়াছে। ইউরোপের উপস্থিত হাঙ্গামাটা

থামিয়া গেলে হয় ত শোনা যাইবে, যে আইনের জোরে সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। অন্ততঃ রাষ্ট্রের কল্যাণার্থ সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্রের কল্যাণ দেখিয়াই এ কালে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বহু দেশে প্রত্যেক বালককে বিদ্যালাভে বাধ্য করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য হয় ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাহে বাধ্য করা হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের এত প্রভুত্ব ছিল না। তবে সমাজের কল্যাণ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হইত বটে। আইনের জোরে বাধ্যতা-প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ধাতুগত নহে। তবে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কার্য্যতঃ কয়েকটী বিষয়ে এই বাধ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে স্বেচ্ছাক্রমে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী থাকিবে, অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাসী হইবে, সে ত বিবাহ করিবেই না। আইনের জোরে তাহাকে বিবাহে বাধ্য করা এ দেশের সমাজব্যবস্থা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারে না। কিন্তু যে গৃহস্থ হইবে, সে বিবাহে কার্য্যতঃ বাধ্য। বিবাহ না করিলে সে ষোল আনা সামাজিকতা পাইবে না। বেদ-বিহিত সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম সপত্নীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে পত্নী গ্রহণ করে নাই, মানবের মর্ত্ত্যজীবনের নিয়ামক দেবগণের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। দেবগণ মনুষ্য-প্রদত্ত যজ্ঞভাগের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহার পত্নী নাই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না; পিতৃগণের সহিতও তাহার মাথামাখি সম্পর্ক ঘটে না। পিতৃগণ পুরুষপরম্পরাদত্ত পিণ্ডভোজনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তির পত্নী নাই, সে বংশধারা-রক্ষায় অশক্ত। পিণ্ডবিচ্ছেদ ভয়ে পিতৃগণ চোকের জল ফেলিতেছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পিণ্ড দেয়, সেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকারী। অতএব, যে ব্যক্তি বংশধারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না, সে পৈত্রিক সম্পত্তিতে পূর্ণমাত্রায় অধিকার পাইতে পারে না। ফলে অপত্নীক ব্যক্তি সামাজিকের পূর্ণ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজভুক্ত অন্য লোকের

সহিত তাহার ষোল আনা সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। সমাজিক জীবনের পূর্ণতার জন্য বিবাহ আবশ্যক। জীবনের সংস্কারের জন্য বিবাহ আবশ্যক। বিবাহ জীবনের অন্তিম সংস্কার। এই হেতু দ্বিজাতি-সমাজে সামাজিক গৃহস্থ কার্য্যতঃ বিবাহে বাধ্য।

কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আচার্য্য-গৃহ হইতে বেদ-বিদ্যা লাভ করিয়া সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহে অধিকার জন্মে। এ কালে পাশ করা ছেলের বিবাহের বাজারে দর বেশী; সে কালে ছেলে পাশ করিয়া আসিতে না পারিলে বিবাহে অধিকারই পাইত না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাচীন কালে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছিল, একালে তাহার বাঁধাবাঁধি নাই; তথাপি ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় একগাছা পৈতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। পৈতা গাছটায় বলিয়া দেয় যে, সে সে যতই মূর্খ হউক, অন্ততঃ বেদের গায়ত্রী মন্ত্রটি, বেদ-বিদ্যার যাহা সার মন্ত্র সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়াছে। মনে করিতে পারি যে, সে কালে শাস্ত্রের বন্ধন এতটা আলগা ছিল না। বেদ-বিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সমাবর্ত্তনে আচার্য্যের অনুমতি পাওয়া যাইত না এবং সমাবর্ত্তন না হইলে কাহারও বিবাহ হইত না। অতএব যে একেবারে গণ্ডমূর্খ, সে বিবাহ করিতে পারিত না, গৃহী হইতে পারিত না, সমাজে এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত। ফলে, থিয়োরি অনুসারে দ্বিজাতি-সমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। প্রত্যেক দ্বিজের পক্ষে বিদ্যালাভ এইরূপে একান্ত আবশ্যক—compulsory—হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহীর পক্ষে বিবাহ যেমন compulsory, বিদ্যালাভও সেইরূপ compulsory, কেন না, মূর্খের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ কালে সাধারণ লোকশিক্ষা ( mass education ) বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু কিরূপে compulsory করা যাইবে, তাহার উপায় হইতেছে না; রাষ্ট্রশক্তিকে এজন্য আহ্বান করা হইতেছে। সে কালে শাস্ত্রকারদের ব্যবস্থায় বিদ্যালাভ

compulsory করা হইয়াছিল; বেদবিদ্যা-লাভে, অর্থাৎ সে কালের উচ্চতম বিদ্যালাভে, বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিবাহ আটকাইয়া এ কালের বিশ্ববিদ্যালয় এ কালের উচ্চশিক্ষা-লাভে সেরূপে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কি না, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় তাহা বিবেচনা করিবেন।

ভারতবর্ষের এই যে অতি পুরাতন সমাজ, থিয়োরি অনুসারে যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তির স্থান ছিল না, যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তি গৃহী বা গৃহপতি হইতে পারিত না, গৃহস্থের অধিকার পাইত না, ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার পাইত না, সমাজ-মধ্যে পতিতপ্রায় হইয়া থাকিত, সেই সমাজই দ্বিজাতি-সমাজ। সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনের যে কোন বর্ণেরই হউক, অথবা যে কোনও মিশ্র বর্ণেরই হউক, সেই দ্বিজ। যে একবার নৈসর্গিক মানব জন্ম পাইয়াছে; আর একবার বেদ-বিদ্যা লাভে সংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া, পূত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম, নূতন সামাজিক জন্ম পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজ। যে ব্রাহ্মণ অপরের ছেলে পড়ায়, অপরকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করায়, সে দ্বিজ। যে ক্ষত্রিয়, রাজকার্য্য করে বা লড়াই করে সে দ্বিজ। আর যে বৈশ্য, গরু চরায়, লাঙ্গল ধরিয়া আপন জমিতে চাষ করে, বা দোকান রাখে, সেও দ্বিজ। সমুদয় বেদ-বিদ্যায়, ষোল আনা কর্ম্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে, ইহাদের সকলেরই ষোল আনা অধিকার জন্মিয়াছে। সেই অধিকারে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। সমাজ-স্থিতির জন্য ও লোক-স্থিতির জন্য তাহাদিগকে কতকগুলি সামাজিক বিধি মানিয়া চলিতে হইত, কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। এই কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের নিগূঢ় তথ্য বুঝা যাইবে না, বেদপন্থী সমাজের জ্ঞানের ইতিহাস এবং কর্ম্মের ইতিহাস সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারা

যাইবে না, ভারতবর্ষের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। অতএব আমি সবিনয় নিবেদন করিতেছি, আপনারা অবধান করুন; আমি যজ্ঞের কথা বলিব।

মনে রাখিবেন, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মনুষ্য-সমাজ একটা কৃত্রিম যন্ত্র। সর্ব্বত্রই কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া সমাজ-বন্ধনের চেষ্টা হইয়াছে। সমাজ-যন্ত্রের জটিলতা কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদনুসারে এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলিরও কোথাও বহুলতা, কোথাও অল্পতা। বহু স্থলে এই সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এক কালে হয় ত একটা তাৎপর্য্য ছিল, এখন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। আজকাল anthropology অর্থাৎ মানববিদ্যা একটা বিজ্ঞানবিদ্যায় দাঁড়াইয়াছে। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া মানব সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। মুখ্যতঃ দুইটা পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, তুলনামূলক আলোচনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তুলনায় আলোচনা করিতে হয়। কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় বৈষম্য আছে, কতটুকু সাদৃশ্য, কতটুকু বৈষম্য আছে, তাহা আলোচনা করিতে হয়। এইরূপ আলোচনায় অনেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক আলোচনা। কোনও একটা সমাজে অতি প্রাচীনকালে কিরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেই দেশের পুরাতন ইতিবৃত্ত থাকিলে, পুরাতন সাহিত্য থাকিলে, তন্মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। যে দেশে ধারাবাহিক সাহিত্য বা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আছে, সে দেশের পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি কিরূপে ক্রমশঃ বিকৃতি বা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিতে পারিলে অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। দেখা যায়, বর্ত্তমানে

যে অনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এক কালে তাহার একটা মানে ছিল। বর্ত্তমানে যাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন এবং নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়, এক কালে তাহার একটা উদ্দেশ্য—একটা অর্থ—ছিল। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, ইংরেজেরা বড় দিনের উৎসবে mistlétoe নামক লতা দিয়া ঘর সাজাইয়া থাকেন। অন্য লতায় না সাজাইয়া মিসিলটো দিয়া কেন সাজান হয়, এখন তাহার কোনও মানে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত ইতিহাসে ইহার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। ইংরেজের দেশে যখন ইংরেজের আবির্ভাব হয় নাই, তখন বৃটনেরা ওকগাছের পূজা করিত। মিসিলটো লতা ওক গাছে পরগাছা হইয়া জন্মে। সে কালের বৃটনেরা সেই লতার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত। বড়দিনে সূর্য্য উত্তর মুখে ঘুরিলে নববর্ষের উৎসবে ড্রুইডেরা সমারোহসহকারে ওক গাছ হইতে সেই লতা কাটিয়া আনিত এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া যজমানদিগকে বিতরণ করিত। মিসিলটো ঘরে থাকিলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিত। মিসিলটো সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। অতএব, উহা ঘরে ঘরে সযত্নে রাখা হইত। এখন সে ড্রুইডও নাই, সে বৃটনও নাই : মিসিলটোর মাহাত্ম্যেও কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু বৃটন দেশ যাহারা দখল করিয়া বাস করিয়াছে, প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সেই বিজেতা ইংরেজেরাও এখনও সেই বড় দিনের উৎসবে পরাজিত বৃটনদের সেই পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখন এই অনুষ্ঠান তাৎপর্য্যহীন ; কিন্তু এক কালে উহার বৃহৎ তাৎপর্য্য ছিল। ইতিহাস আলোচনায় তাহা আবিষ্কৃত হয়। ঐ বড়দিনের উৎসবটাই দেখুন না। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, বড় দিনের উৎসব সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোনও আকারে বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে একদিন উত্তর মুখে ফেরে ; অতি অসভ্য জাতিও সেই দিনটাকে লক্ষ্য করে। সেই দিন শীত ঋতুর অবসান সূচনা করে।

সমস্ত পৃথিবী মূর্ত্তি বদলাইবার উদ্‌যোগ করে। সে দিনটা সকলেরই পক্ষে আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আমরাও উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে নানা পুণ্য কর্ম্ম করি। পৌষ মাস পুণ্য মাস। পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা, পিঠাপার্ব্বণের উৎসব। যীশুখ্রীষ্টের কোন্ তারিখে জন্ম হইয়াছিল, কোনও খ্রীষ্টান তাহা জানে না। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, মানব জাতির ইতিবৃত্তে একটা নূতন পরিচ্ছেদ প্রবর্ত্তন করিলেন। খ্রীষ্টানেরা কল্পনা করিয়া লইল, ঐ বড় দিনে চরাচর পৃথিবী যখন নব জীবনের উদ্যম করে, তখন সেই দিনই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড় দিনে যে উৎসব প্রচলিত ছিল, তাহাকেই বিকৃত এবং রূপান্তরিত করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে পরিণত করা হইল। যাহার তাৎপর্য্য ছিল এক রূপ, তাহাতে তাৎপর্য্য দেওয়া হইল অন্য রূপ।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই বৈজ্ঞানিক রীতির পরিচয় পাইবেন। বর্ত্তমান কালে anthropology বিদ্যাটা খুব বড় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার মধ্যে যতটা আস্ফালন আছে, ততটা ফল ধরে নাই। এখনও উহার পদে পদে মতদ্বৈধ আর সংশয়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে এত মতভেদ, যে কোনও সিদ্ধান্তকে একেবারে চাপিয়া ধরা যায় না। তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। এ বিদ্যা এখন বিজ্ঞানবিদ্যা। বিজ্ঞানবিদ্যার ইহা দোষও বটে, গুণও বটে। কোন সিদ্ধান্তকে একবারে পাকা করিয়া ধরা বিজ্ঞানবিদ্যার স্বভাব নয়। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তকেই পূর্ণতার এবং পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ। বিজ্ঞানবিদ্যা যে পথে চলিতেছে, সেই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যার পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। উহা সংশয়ের পথ, দ্বৈধের পথ। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

গোঁড়া খ্রীষ্টানকে যদি বলা যায়, যে তাঁহাদের বড় দিনের উৎসবের সহিত যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা খ্রীষ্টানের বিশিষ্ট

উৎসব নহে, মনুষ্য সাধারণের উৎসব, তাহা হইলে তিনি হয় ত চটিয়া যাইবেন। তাঁহার আজন্ম বিশ্বাস যে ঐ সময়েই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসের অনুরোধেই তিনি ঐ উৎসবের অনুষ্ঠানে সমস্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ অর্পণ করিয়াছেন। সেই বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া দিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও তিনি ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবেন। ফলে মানুষের conductএর উপর, কর্ম্মের উপর, প্রজ্ঞার—Reasonএর—প্রভুত্ব বড় অধিক নহে। সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যজীবনের নিয়ামক। প্রজ্ঞা ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া মানুষকে শাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হয় না। কর্ম্মপথে বাহির হইয়া মানুষ সহজে প্রজ্ঞার শাসন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত রিলিজনের যে একটা বিরোধ আছে, যে বিরোধ কখন মিটিবার নহে, তাহার মূল এইখানে। সামাজিক মনুষ্যের কর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এ কথাটাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানবিদ্যা যাহাই বলুন, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিকাংশ সামাজিক অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। অবৈজ্ঞানিক মানুষ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রও নহে। কিন্তু সে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা মনগড়া তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া সেইটাকেই আঁকড়াইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কল্পনার দৌড় নাই, সে অপরের প্রদত্ত অর্থ মানিয়া লইয়া তাহাকেই জড়াইয়া থাকে। যাঁহাদের কল্পনার দৌড় অধিক, তাঁহারা নানারূপ তাৎপর্য্যের আরোপ করেন এবং ইতর সাধারণে সেই সকল আরোপিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করে।

আর্য্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বেদপন্থী সমাজ

স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও প্রাচীন কালে যাইতে হয়। ভারতীয় এবং পারসীক ধর্ম্ম-গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও যজ্ঞানুষ্ঠান কোনও না কোনও প্রকারে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে, তাহাও আপনারা জানেন। এ সব আপনাদের জানা কথা। ইহা লইয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কালক্রমে অত্যন্ত পল্লবিত হইয়া অত্যন্ত জটিলতা পাইয়াছিল। বহু অনুষ্ঠানের গোড়ার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাৎপর্য্য আরোপ করিবার লোকের অভাব ছিল না। কল্পনা-শক্তিতে ভারতবর্ষের লোক কোনও দেশের লোকের নিকট কখন হারি মানে নাই। আপনারা বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। কোন্ যজ্ঞে কি কি অনুষ্ঠান, তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল ব্রহ্মবাদী। তাঁহাদের কল্পনার দৌড় অসীম ছিল। কোনও স্থানেই তাঁহারা পিছ-পা হইতেন না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলির পর পর বিবরণ দিয়া যাইতেছেন এবং কোন্ অনুষ্ঠানের কি অর্থ, কি তাৎপর্য্য, তাহা অসঙ্কোচে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছেন; অত্যন্ত সরল ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা বলিয়া যাইতেছেন; তাঁহাদের মুখ হইতে যে সকল বাক্য বাহির হইতেছে, তাঁহারা যেন তাহাদের জন্য আদৌ দায়ী নহেন। ঐ সকল বাক্যের অনুকূলে কোনও যুক্তি তর্ক আছে কি না, ঐ সকল বিচারসহ হইবে কি না, ইহা বিবেচনা করিতে তাঁহাদের অবসর মাত্র নাই। ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাদিগকে বলাইতেছেন, তাঁহারা বলিয়া যাইতেছেন। স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুই জন ব্রহ্মবাদী দুই

রকমের তাৎপর্য্য দিতেছেন। একজন অপরের কথা খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও পক্ষেরই কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। উভয়পক্ষই আপনার কথা সমান জোরে বলিয়া যাইতেছেন। উভয়ের বাক্যই বেদবাক্য।

বেদ কাহাকে বলে, যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই লইয়াই বেদ। সামাজিকের পক্ষে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই তুল্যমূল্য, উভয়ই বেদবাক্য, উভয়ই নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া বাক্য নহে। ব্যক্তিবিশেষে উহা প্রচার করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নাম ঋষি। বেদের মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়—ঋক্, যজুঃ, এবং সাম। ঋক্ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা বাক্য, একালে যাহাকে পদ্য বলে; ইংরেজিতে verse বলা যাইতে পারে। যজুর্মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা নহে। ওগুলি গদ্য মন্ত্র; ইংরেজিতে prose formula বলা হয়। সাম মন্ত্র বলিয়া পৃথক্ মন্ত্র নাই। ঋক্ মন্ত্রকে কোনও একটা সুর দিয়া গাহিলেই উহা সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। কোনও একটা verseএর বা পদ্যের ছন্দ বজায় রাখিয়া আওড়াইলে হয় ঋক্, আর সুর দিয়া গাইলেই হয় সাম। যাজ্ঞিকেরা নিগদ মন্ত্র এবং প্রৈষ মন্ত্র বলিয়া আর এক শ্রেণীর মন্ত্রের উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলিও গদ্যময় বাক্য। অতএব তাহাদিগকে যজুর্মন্ত্রের প্রকারভেদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ফলে ঋক্, যজুঃ আর সাম এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র ব্যতীত আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। এই জন্যই মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যাকে ত্রয়ীবিদ্যা বলে। বেদ তিনখানা না চারিখানা, এই লইয়া একটা তর্ক আছে। আপনারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের কথা শুনিয়াছেন। এ কালের অনেক পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্, যজুঃ, সাম এই

তিন বেদই প্রাচীন বেদ। চতুর্থ অথর্ব্ব বেদকে পরবর্ত্তী কালে জোর করিয়া বেদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। এরূপ ভাবে ধরিলে উত্তরটা ঠিক হয় না। আসল কথা এই যে, বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণীর, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা চারিখানা। বেদমন্ত্রের সংগ্রহের নাম সংহিতা। অধিকাংশ ঋক্ (মন্ত্র) একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই ঋক্-সংহিতা। ঐরূপ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ একত্র করিয়া যজুঃসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানে গান করিতে হইত, সেইগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সামসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপে সঙ্কলিত মন্ত্র ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত মন্ত্র ছিল, যেগুলি সাধারণ যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না, যেগুলি শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিকে একত্র করিয়া অথর্ব্বসংহিতা সঙ্কলিত হই-য়াছে। এই অথর্ব্ব সংহিতারও অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ মন্ত্র। ফলে ঋক্, যজুঃ, সাম ছাড়া আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। বেদ-মন্ত্র তিন শ্রেণীর, কিন্তু বেদ-সংহিতা বা collection চারিখানি। প্রত্যেক মন্ত্র কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। প্রচারিত হইয়াছিল বলিলাম, কেন না, কোন ব্যক্তি কোন বেদমন্ত্র রচনা করিয়া-ছেন, এ কথা বেদপন্থী কিছুতেই বলিতে চাহিবেন না। যিনি যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। যে মন্ত্রে যে দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মন্ত্রের কোনও না কোনও কর্ম্মে, কোনও না কোনও অনুষ্ঠানে, বিনিয়োগ হইত। যাজ্ঞিকদের মতে প্রত্যেক মন্ত্রই কোনও না কোনও কাজে লাগিবে, কোনও না কোনও অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে। অকেজো মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। অতএব শুধু মন্ত্রের সংহিতা লইয়া, মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া সমাজের বিশেষ কোনও লাভ নাই। সামাজিকের জন্য বেদমন্ত্র-গুলির সার্থকতা দেখাইতে হইবে। এইজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবশ্যকতা।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়; কখন্ কি ভাবে প্রযুক্ত হয়; সেই কর্ম্মে সেই মন্ত্রের স্বার্থকতা কি; অন্য মন্ত্রের প্রয়োগ না হইয়া সেই মন্ত্রেরই প্রয়োগ হইল কেন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে সকল ব্রহ্মবাদী এই সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। তাঁহারাও যেন ভিতরের প্রেরণা বলে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ এবং মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সমাজের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ভিতরের প্রেরণা, এই inspiration, সকলের নাই। অতএব মন্ত্র যেমন বেদবাক্য, মন্ত্র-সম্পর্কে যে ব্রাহ্মণ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বেদবাক্য। অতএব, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় লইয়াই বেদ।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং তদনুসারে সমাজের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে সকল বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদপন্থী সমাজের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সেইখানে। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া বলা হয়, বেদবাক্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত বাক্য স্বতঃপ্রমাণ। উহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও বাক্যের সহিত যদি সেই বেদবাক্যের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই সব বাক্য অগ্রাহ্য। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রচারকর্ত্তা ব্রহ্মবাদীদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ ছিল। একই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। অনুষ্ঠানসম্পর্কে বিধি-নিষেধেরও ভিন্নতা ছিল। অথচ প্রত্যেকের উক্তিই বেদবাক্য। এই বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য পরবর্ত্তী পণ্ডিতদিগকে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। পরস্পরবিরোধী বিধিনিষেধ বাক্যের কোনরূপ

সামঞ্জস্য সাধন না করিলে সামাজিক লোক কোন্ পথে চলিবে? এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া কর্ম্মমীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের একটা বিপুল শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল।

মীমাংসাদর্শন বলিলে আমরা এই দর্শনকেই বুঝি। পরস্পরবিরোধী বেদবাক্যের সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য মীমাংসাদর্শন যে সকল rule বা canon প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সমস্ত বেদপন্থী সমাজ তাহা মানিয়া লইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত Jurisprudence এর ভিত্তি পত্তন ঐখানে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলেই মীমাংসা-দর্শনের দোহাই দিতে হয়, এবং মীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। সকল দেশে সকল সমাজে লোকস্থিতি কতকগুলি কৃত্রিম conventionএর উপর স্থাপিত। সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি যাহাই হউক, উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কার্য্যতঃ কতকগুলি conventionএর উপর, কতকগুলা fictionএর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোকে যাহা মানিয়া লয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হউক আর না হউক, তাহাই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। ব্যবহারশাস্ত্রবিদেরা অর্থাৎ আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সকল fictionএর কথা বেশ জানেন। এ বিষয়ে আমার বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যজ্ঞের কথায় ফিরিয়া আসা যা'ক। 'যজ্ঞ' শব্দটা কখন অতি সঙ্কীর্ণ এবং কখন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাজ্ঞিক পণ্ডিতেরা যজ্ঞ শব্দের একটা অর্থ দিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এখানে তিনটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে। দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। এই তিনটি শব্দেরই সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থ আছে, এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থও আছে। আমি যজ্ঞের তাৎপর্য্য অন্বেষণে উপস্থিত হইয়াছি। সঙ্কীর্ণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে

সঙ্কীর্ণ অর্থই গ্রহণ করিব; তারপর ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে আসা যাইবে। সঙ্কীর্ণ অর্থে দেবতা, দ্রব্য ও ত্যাগ বলিলে কি বুঝায়, স্থূলতঃ তাহা আপনারা জানেন। বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে। ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি। এই সকল দেবতার উদ্দেশে কোনও না কোনও দ্রব্য ত্যাগ করা হইত। ত্যাগকর্ম্মের নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হইত, তাহা হব্য। নানাবিধ দ্রব হব্যরূপে দেওয়া হইত। দৃষ্টান্ত, আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞার্থ সংস্কৃত ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি, পশুমাংস, সোমলতার রস, ইত্যাদি। এই দ্রব্য-ত্যাগকর্ম্মের নামই যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তিনি যাজক বা ঋত্বিক্। যাগকর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইত। প্রত্যেক কর্ম্মেরই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। আগেই বলিয়াছি, কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই মন্ত্রের সার্থকতা। যে মন্ত্র কোনও কাজে লাগে না, সে মন্ত্র নিরর্থক। মন্ত্র তিন শ্রেণীর,—ঋক্, যজু, সাম। যে সকল যজ্ঞে এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, সেখানে এক জন যাজকে কাজ চলিত না। একাধিক যাজক আবশ্যক হইত। কোন ঋত্বিক্ ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন—স্পষ্ট ভাবে—উচ্চৈঃস্বরে। কেহ বা যজুর্মন্ত্র আওড়াইতেন—নিম্নস্বরে। কেহ বা সাম মন্ত্র গান করিতেন। বড় বড় যজ্ঞে এই তিন শ্রেণীর যাজক বা ঋত্বিক্ আবশ্যক হইত;—ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী। ঋগ্বেদী প্রধান যাজকের নাম ছিল হোতা। ইনি ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন। হোতা শব্দে আপনারা হোমকারী বুঝিবেন না। হোতা শব্দ আহ্বানার্থক হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। যিনি ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন, তিনিই হোতা। হোতাকে আহুতি দিতে হইত না। যিনি আগুনে আহুতি দিতেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু। তিনি অগ্নিতে

হব্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞের উপযোগী হব্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইত। এই সকল কর্ম্মে তাঁহাকে যজুর্মন্ত্র আওড়াইতে হইত। কাজেই অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্। বড় বড় যজ্ঞে আহ্বানকর্ত্তা হোতার এবং আহুতিদাতা অধ্বর্য্যুর অন্যান্য সহকারী থাকিতেন। সাম গানের জন্য প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্গাতা। যজ্ঞবিশেষে তাঁহারও সহকারী আবশ্যক হইত। ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী এবং সামবেদী এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্ম্ম পরিদর্শনার্থ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনার্থ, আর একজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকিতেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। এক হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের কর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন। অতএব, তিন বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা আবশ্যক। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মা নামেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হইতেছে। কেন না, সে কালে বেদবাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। বেদপন্থী সমাজে যে বর্ণের লোকের উপর এই ব্রহ্মবাক্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ। অতএব, ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে যিনি ত্রিবেদজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম ব্রহ্মা। যজ্ঞবিশেষে এই ব্রহ্মারও সহকারী আবশ্যক হইত।

যজ্ঞ মাত্রেই কর্ম্ম এবং প্রত্যেক কর্ম্মেরই কোনও না কোনও ফল আছে। সেই ফল ইহলোকেও পাওয়া যাইতে পারে, পরলোকেও পাওয়া যাইতে পারে। কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা বিচার করিয়া পাওয়া যায় না। কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল, তাহা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁহাদের বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা—inspirationএর দ্বারা—জানিতে পারিতেন। যজমানের হিতার্থ যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। সপত্নীক যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন ; উভয়ে তুল্যরূপে ফলভাগী হইতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনও

বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত না। বেদমন্ত্র যথারীতি অভ্যাস করিতে হইলে আচার্য্য-গৃহে গিয়া বহু বৎসর বাস করিতে হইত। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ আচার্য্য-গৃহবাসের সুবিধা বা সম্ভাবনা না থাকায় স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে দেখিতে পাই, নারীগণেও বেদমন্ত্র প্রচার করিতেছেন, নারীগণের মধ্যেও ঋষি আছেন, ব্রহ্মবাদিনী আছেন। এমন কি, আচার্য্য-গৃহে উপনীত হইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু এ কালে যেমন licensed residenceএ বাস না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণে অধিকার জন্মে না, সেইরূপ বিনা উপনয়নে অর্থাৎ বিনা আচার্য্য-গৃহবাসে বেদবিদ্যা লাভের সুযোগ না ঘটায় স্ত্রীলোকেরা ক্রমশঃ বেদাভ্যাসে সুযোগ ও বেদের উচ্চারণে অধিকার হারাইয়াছিলেন। বেদমন্ত্রের উচ্চারণ নিতান্ত সহজ কথা নহে। যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষা নামে একটা বেদাঙ্গ বিদ্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেদের ভাষা যখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তখন আচার্য্যের বিনা উপদেশে বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ হইতে পারিত না। আবার যথোচিত উচ্চারিত না হইলে বেদমন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না। এমন কি, উলটা ফল হইবারও আশঙ্কা থাকে। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণ দোষে কিরূপ ফল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সে গল্প আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যজমানের পত্নী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে না পারিলেও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল। কেন না, পত্নী উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না; পত্নীকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে হইত; এবং যজমান-পত্নীও যজ্ঞফলের সমান ভাগ পাইতেন।

যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি নিত্য—কতকগুলি কাম্য। কাম্যকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন। যিনি বিশেষ কোনও ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি

তদনুযায়ী কাম্যকর্ম্ম করিবেন ; না করিলে কোনও হানি নাই। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য ; না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। কিন্তু সেই নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কোনরূপ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। সমাজে হয় ত নিন্দা হইত ; সমাজে পাতিত্য হইত কি না, তাহা বলিতে পারি না। এদেশের সমাজবিধি কাহাকেও জোর করিয়া কোন কাজ করাইতে চাহে না। নিত্যকর্ম্ম না করিলে যে পাপ, কর্ম্মকর্ত্তা তার ফল ভোগ করিবে। অন্যের তাহাতে যায় আসে কি ?

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিতেন। আচার্য্যের বাড়ীতে অগ্নি থাকিত। উহা আচার্য্যের নিজস্ব অগ্নি। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আচার্য্যের সেই অগ্নিতে একখানি কাঠ ফেলিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার সমিৎ হোম। যজ্ঞিয় কাঠের টুক্‌রার নাম সমিৎ। আচার্য্যগৃহে বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে অথবা সমাবর্ত্তনের পরে অগ্নি স্থাপন করিতে হইত। পত্নী-গ্রহণ কালে এই অগ্নিতেই লাজ-হোমাদি সম্পন্ন করিতে হইত। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত্ত অগ্নি। গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় স্মার্ত্তকর্ম্ম অর্থাৎ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এই গৃহ্য অগ্নিতেই সম্পাদিত হইত।

এই পাকযজ্ঞ শব্দটির মানে বুঝা দরকার। এখনও গৃহস্থের ঘরে যাগ যজ্ঞ কিছু না কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্যামাপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক পূজায় হোমের অনুষ্ঠান হয়। এই হোম তান্ত্রিক হোম ; ইহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। হয় ত ইহা বৈদিক যজ্ঞের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু এই তান্ত্রিক হোম ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞ কিছু না কিছু আজিও প্রচলিত আছে। উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মে যজ্ঞ করিতে হয়। এ সকল যজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এগুলির নাম গৃহকর্ম্ম বা স্মার্ত্তকর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত

আর এক শ্রেণীর বৈদিক কর্ম্ম ছিল; সেগুলির নাম শ্রৌতকর্ম্ম। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই সকল যজ্ঞ শ্রৌতযজ্ঞ। শ্রৌতকর্ম্ম উপদেশের জন্য এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি শ্রৌতসূত্র। আর গৃহ্যকর্ম্ম উপদেশের জন্য আর এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনও আমরা করিয়া থাকি; এখনও উহা সমাজে চলিত আছে। কিন্তু শ্রৌতসূত্রের উপদিষ্ট শ্রৌতকর্ম্মের অধিকাংশই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। খুব সম্ভব, বৌদ্ধ বিপ্লব এজন্য দায়ী। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী, বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন। আগে বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত, ও পুনরায় দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। এই বিপ্লবে যাজকতাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের জীবিকা-লোপের উপক্রম হইল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, যাহারা বড় লোকের ঘরে যাজকতা করিয়া জীবিকা লাভ করিত, তাহাদের অন্ন-লোপের উপক্রম হইল। আচার্য্যগৃহে বহু বৎসর বাস করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড অভ্যাসের প্রয়োজন থাকিল না। বহু বৎসর ধরিয়া বেদাভ্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ব্বে যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। উপনয়ন এবং সমাবর্ত্তন কর্ম্মের নাম মাত্র থাকিল না, সার্থকতা থাকিল না। ফলে অভিজ্ঞ যাজকের অভাবে জটিল শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিও অপ্রচলিত অথবা একবারেই লুপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ বেদকে একবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; অন্ততঃ গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করিতে

পারিলেন না। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুশণ্ডিকাদি গৃহ্য যাগ এখনও এখনকার দ্বিজাতি-সমাজে চলিত আছে।

গৃহ্য অগ্নির কথা বলিতেছিলাম। এই অগ্নিতে যাবতীয় গৃহ্য কর্ম্ম অর্থাৎ যাবতীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত কর্ম্মের নির্ব্বাহ হয়। গৃহ্য অগ্নি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার দরকার নাই। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রৌত অগ্নির কথা এবং শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য শ্রৌত যজ্ঞের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই জন্য আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

এই শ্রৌত অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার। গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এই শ্রৌত অগ্নির আবশ্যকতা। কিন্তু শ্রৌত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। যিনি অবিবাহিত, তাঁহার শ্রৌত অগ্নিস্থাপনে অধিকার নাই। বিবাহের পর গৃহস্থের নাম হইত গৃহপতি। বাড়ীর মধ্যে কোনও স্থানে অগ্নিশালা বা অগ্ন্যাগার স্থায়িভাবে নির্ম্মিত হইত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগার-মধ্যে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্ম্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। সংক্ষেপে উহার বিবরণ দিতেছি।

আপনারা তিন অগ্নির নাম শুনিয়াছেন। গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তিন দিকে তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান, এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান। মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নির্ম্মিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার, দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার। তিনেরই ক্ষেত্রফল বা area সমান। এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত, ক্ষেত্রের সমান। গার্হপত্য অগ্নি,

উহা গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ। এই অগ্নিকে গৃহের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি; উহাতেই দেবতাদের উদ্দেশে যাবতীয় দ্রব্যের আহুতি হয়। আহুতি হয় বলিয়াই নাম আহবনীয়। দেবতারা পূর্ব্ব দিকের অধিবাসী, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের অধিপতি। আজিও আমরা পূর্ব্ব মুখে বসিয়া দেবতাদের পূজা করি। এইজন্য আহবনীয়ের স্থান পূর্ব্ব দিকে। দক্ষিণ দিক্ পিতৃগণের। পিতৃগণের রাজা যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট দ্রব্য দেওয়া হয়। অগ্ন্যাধান কর্ম্মের পূর্ব্ব দিনে দেহ-শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া যজমান কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ বিহিত স্থান হইতে আগুন আনিয়া গার্হপত্যের স্থানে রাখিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ ও তাঁহার পত্নী অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সেই খানেই রাত্রিবাস করেন। এমন এক কাল ছিল, যখন কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন করিতে হইত। যজ্ঞকর্ম্মের সেই প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহাকে বলে survival in culture; সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, কোনও দেশেই লোকে প্রাচীন প্রথা সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। পুরাতনের মোহ কাটাইতে চায় না। শমীবৃক্ষের পরগাছারূপে যে অশ্বত্থ গাছ জন্মে, উহার কাঠ ঘষিলে সহজে আগুন জন্মে। ঐ কাঠে দুই খানি অরণি প্রস্তুত হয়। অরণিদ্বয় অগ্নিশালাতেই রাত্রির মত রক্ষিত হয়। গার্হপত্যে যে আগুন রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সমিৎ অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। যজমান রাত্রি জাগিয়া উহা জ্বালাইয়া রাখেন। প্রাতঃকালে অধ্বর্য্যু সেই অগ্নি নিবাইয়া দেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরণি ঘর্ষণের দ্বারা নূতন আগুন উৎপাদন করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নিমন্থন। অগ্নিমন্থনের পূর্ব্বে একটি ঘোড়া আনিয়া রাখিতে হয়। যজমান একখানি অরণি ধরিয়া বসেন। দ্বিতীয় অরণি

দ্বারা প্রথমে তাঁহার পত্নী, পরে অধ্বর্য্যু, অগ্নি উৎপাদন করেন। মাটীর খাপরায় গোবরের ঘুঁটা রাখিয়া তাহাতেই সেই মন্থনোৎপন্ন অগ্নি গ্রহণ করা হয়। যজমান উহাতে ফুঁ দিয়া জ্বালাইয়া দেন। অধ্বর্য্যু সেই আগুনে যজ্ঞীয় কাঠ জ্বালাইয়া গার্হপত্যে রাখেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সেই সময়ে সাম গান করেন। গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া অধ্বর্য্যু আহবনীয় স্থানে চলেন। ঘোড়াটি আগে আগে চলে। যজমান চলেন ঘোড়ার পশ্চাতে। ব্রহ্মা সাম গাইতে থাকেন। আহবনীয়ের স্থানে একটি পা রাখিয়া ঘোড়াটি পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। ঘোড়ার সেই পায়ে সেই অগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধ্বর্য্যু সেই আগুন আহবনীয়ে রাখিয়া দেন। ব্রহ্মা তখন আবার সাম গান করেন। এইরূপে গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির স্থাপন হইলে অধ্বর্য্যু পুনরায় গার্হপত্য হইতে আগুন লইয়া দক্ষিণাগ্নির স্থানে রাখিয়া দেন। এইরূপে তিন অগ্নি স্থাপনের পর ব্রহ্মা তিন বারে তিনটি সামগান করেন। তৎপরে সকলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দেন। তৎপরে পূর্ণাহুতি হোম। গার্হপত্যের আগুনে খানিকটা ঘি গরম করা হয়। অধ্বর্য্যু জুহূ নামক কাঠের হাতা দ্বারা সে ঘি লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে বসিয়া যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেন। যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল পূর্ণাহুতি। এই পূর্ণাহুতিতেই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। অগ্ন্যাধানের পর কয়েক দিন যজমান ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। গার্হপত্যের আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতে থাকে। উহাকে নিবাইতে দেওয়া হয় না। উহা নিবাইলে প্রত্যবায় ঘটে। আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি দিবারাত্রি জ্বলে না, আবশ্যক মত গার্হপত্য হইতে আগুন আনিয়া ঐ দুই অগ্নি জ্বালান হয়, এবং তাহাতে দেবতাগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাগ হয়।

এই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম যজমানের জীবনে অতি প্রধান কর্ম্ম। অগ্ন্যাধানের

পর তাঁহার বিশেষণ হয় আহিতাগ্নি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ ষোল আনা গৃহস্থ। অগ্ন্যাধানের পর তিনি যাবতীয় শ্রৌত কর্ম্মে, যাবতীয় দেবযজ্ঞে এবং পিতৃযজ্ঞে, অধিকার লাভ করেন। দেবগণ এবং পিতৃগণ অলক্ষ্য ভাবে মানুষের মর্ত্ত্য-জীবনের নিয়ামক, শুভাশুভ-ফলদাতা। আগেই বলিয়াছি, দেবগণ মনুষ্যদত্ত হব্যভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পিতৃগণ স্বধাভোজনের প্রয়াসী। দেবগণের নিকট এবং পিতৃগণের নিকট মানুষের ঋণ আছে, সেই ঋণ মোচন করিয়া না দিয়া যাইতে পারিলে মানব জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব জীবনের সম্পূর্ণতা-বিধানের জন্য দেবগণের এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেই হইবে। অতএব, গৃহস্থের পক্ষে আহিতাগ্নি হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ অগ্নির দ্বারা দেবগণের এবং পিতৃগণের প্রাপ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অগ্নি নিজেও একজন দেবতা এবং তিনি দেবগণের পুরোহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম ঋকটিই স্মরণ করিবেন, অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্, যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্। অগ্নি দেবগণের পুরোহিত, তিনিই হোতা নামক ঋত্বিক্ অর্থাৎ তিনিই দেবগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞস্থলে ডাকিয়া আনেন; তিনিই দেবগণের মুখ; তাঁহার মুখে হব্য দান করিলে দেবগণকে দেওয়া হয়। তিনিই হব্যবহ; দেবগণের জন্য হব্য বহন করিয়া লইয়া যান। গার্হপত্য অগ্নি বস্তুতঃ এক পক্ষে গৃহস্থের, অন্য পক্ষে দেবগণের মধ্যবর্ত্তী। তিনিই গৃহস্থালীর এক রকম কর্ত্তা এবং শুভাশুভ-দাতা। অতএব গার্হপত্য অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে বলিবেন, অগ্নির মাহাত্ম্য কেবল বেদপন্থী সমাজের একচেটিয়া নহে; অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য সমাজেও অগ্নির দেবত্ব স্বীকৃত হয়। অগ্নিমুখেই যে দেবতারা খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। দেবতারা সূক্ষ্মশরীরী, তাঁহারা স্থূল অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কোনও দ্রব্য আগুনে ফেলিলে

তাহা ধূমে, বাষ্পে, বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপে সূক্ষ্মতা পাইলে উহা দেবতাদের সূক্ষ্মদেহের উপযোগী হয়। দেবতারা ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন। অগ্নিশিখা স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধমুখী, উহা ধূম এবং বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দেবতাদের খাদ্য দেবতাদিগকে পৌছাইয়া দেয়। বিশেষতঃ, আর্য্যজাতির মধ্যে অগ্নির মাহাত্ম্য বিশেষ বলবৎ ছিল। পণ্ডিতেরা হয় ত বলিবেন, আর্য্যজাতি এক কালে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাদের নিকট অগ্নির এত মাহাত্ম্য। বাল গঙ্গাধর টিলক মহাশয় হয় ত বলিবেন, এই অগ্নিমাহাত্ম্য আর্য্যজাতির সুমেরুপ্রদেশ বাসেরই সমর্থন করিতেছে। যেখানে ছয়মাস ধরিয়া রাত্রি, সেইখানে আগুনের সমাদর এবং চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়া রাখার বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? কাস্পীয় সাগরের তীরে বহু প্রদেশে কেরোসীন তেলের আকর আছে। ভূগর্ভ হইতে সর্ব্বদা কেরোসীনের বাষ্প উদ্গত হয় এবং আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। সে দেশের লোকের পক্ষে অগ্নিপূজা স্বাভাবিক। এখনও সেই দেশে অগ্নির মন্দির দেখা যায়। যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যজাতি এক কালে মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, তাঁহারা এই অনুমানে খুসী হইবেন। গ্রীক্ এবং রোমানেরা আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যেও অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা আপনারা জানেন। প্রাচীন গ্রীক্‌দের অগ্নিদেবতার নাম Hestia। প্রত্যেক গ্রীক্ গৃহস্থের ঘরে অগ্নিশালা থাকিত। সেখানে অগ্নি রক্ষিত হইতেন ও পূজা পাইতেন। গ্রীকেরা যখন নিজের দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইতেন, তখন আপন গৃহস্থিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির সম্বন্ধ থাকা হইত। গ্রীক্‌দের মধ্যে যিনি Hestia, রোমানদের মধ্যে তাঁহার নাম Vesta; Vesta দেবতা রোম নগরের, রোমের রাষ্ট্রের রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। সাধারণ স্থানে তিনি পূজা পাইতেন। কয়েক জন কুমারী

অগ্নিরক্ষার্থ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদিগকে কৌমার ধর্ম্ম পালন করিতে হইত। তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। পারস্যবাসী ইরাণীদের কথা বলা অনাবশ্যক। প্রাচীন ইরাণী সমাজের সহিত প্রাচীন বেদপন্থী সমাজের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা আমাদের মতই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, ইহা আপনারা সকলেই জানেন।

অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে একটি ঘোড়ার দরকার হইত, ইহা বলিয়াছি। এই ঘোড়াটির তাৎপর্য্য কি, বলা কঠিন। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার কি তাৎপর্য্য বাহির করিবেন, তা জানি না। শুনিতে পাই, ঘোড়ার সহিত আর্য্যজাতির একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যজাতি নাকি প্রথমে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া মানুষের ব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন, domesticate করিয়াছিলেন। মধ্যএশিয়ায় ক্যাস্পীয় এবং আরাল সাগরের তীরবর্ত্তী steppes জমীতে প্রচুর ঘাস হয়। এখনও হয়, পূর্ব্বে আরও হইত। সেই জমি অশ্বপালনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। আর্য্যগণ ঘোড়ায় চড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে তাঁহারাই প্রথমে ঘোড়ার আমদানি করেন। ভারতবর্ষে তাঁহারা অশ্বারোহী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভসূচক প্রথম অনুষ্ঠানে এই জন্যই ঘোড়া আনিতে হইত। আমার এই অনুমানে আপনারা হয় ত হাসিবেন। ইহা নিশ্চয় একটা survival। অগ্ন্যাধানে ঘোড়ার উপস্থিতির একটা কিছু সার্থকতা অতি পূর্ব্বে ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু প্রথাটা থাকিয়া গেল। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের সহিত ঘোড়ার তুলনা বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাক-ডোনেল তাঁহার Vedic Mythologyতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; আপনারা দেখিতে পারেন। সূর্য্য বেদপন্থী সমাজের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি

ত সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষের মত আকাশপথে ভ্রমণ করেন। তিনি নিজেই যেন ঘোড়া। সূর্য্যের অশ্বরূপ বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। একবার ত্বষ্টার সহিত তাঁহার জামাতা সূর্য্যের ঝগড়া হইয়াছিল। ছায়া এবং সংজ্ঞাঘটিত সেই গল্প অপনারা জানেন। সূর্য্য সেখানে অশ্বমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য যখন ঋষিকে নূতন যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি বাজি বা অশ্বরূপে ঋষিকে দেখা দিয়াছিলেন। অগ্ন্যাধান-কর্ম্মে ঘোড়াটি প্রথমে পূর্ব্বমুখে চলে, তাহার পর আহবনীয়ে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম মুখে দাঁড়ায়, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ঘোড়া সেখানে সূর্য্যেরই কল্পিত প্রতিনিধি, এবং ঘোড়াটির যাতায়াত সূর্য্যেরই দৈনিক আবর্ত্তনসূচক। এই অনুমানটাও আমি ছাড়িয়া দিলাম, আপনারা ইচ্ছা হয় লইবেন।

অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতি দিন অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। এই অগ্নিহোত্র যাগ নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। আহ-বনীয় অগ্নিতে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিতে হইত। ইহাই অগ্নিহোত্র। সূর্য্য এবং অগ্নি উভয়েই জ্যোতিঃস্বরূপ। যেন একই দেবতার দুই মূর্ত্তিভেদ। অগ্নির স্থল পৃথিবী লোক, এবং সূর্য্যের স্থল দ্যুলোক। এই দুই দেবতাকে আহুতি দিলে সকল দেবতাকেই একরকম তৃপ্ত করা হয়। কেন না, সকল দেবতাই জ্যোতিঃস্বরূপ। এইরূপে সূর্য্যের সহিত অগ্নির সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে ঘোড়ার পায়ে অগ্নি স্পর্শ করিয়া সেই অগ্নির প্রতিষ্ঠার মূল এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অগ্নিহোত্রের কথা বলিতে চাহি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও প্রাতে শ্রৌত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন। ইহা গৃহস্থের নিজের

কাজ। অশক্ত পক্ষে প্রতিনিধির দ্বারা চলিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামাতা প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারে। অধ্বর্য্যু দ্বারাও চলিতে পারে। স্বয়ং আহুতি দিলে যে ফল, প্রতিনিধির দ্বারা দিলে ফল তার চেয়ে অল্প। অগ্নিহোত্র সম্পাদনের জন্য গৃহস্থ ঘরে একটি গাভী রাখে, তাহার নাম অগ্নিহোত্রী গাভী। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেই গাভীর দুগ্ধ লইয়া মাটির মালসায় রাখিয়া গার্হপত্যের আগুনে তপ্ত করিতে হয়। আহুতির জন্য দুইখানি কাঠের হাতা দরকার। একখানি ছোট হাতা, তাহার নাম স্রুব। একখানি বড় হাতা, তাহার নাম অগ্নিহোত্রহবনী। মালসার দুধ স্রুব দ্বারা চারি বারে অথবা পাঁচ বারে লইয়া অগ্নিহোত্র হবনীতে ঢালিতে হয় এবং সেই অগ্নিহোত্রহবনীর দুধ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে পত্নীর সহিত গৃহস্থ অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালাইয়া দেন। পরে গার্হপত্যের আগুনে দুধ জ্বাল দিয়া সে দুধ যথাবিধি স্রুবদ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে গ্রহণ করেন। তার পর আহবনীয় অগ্নিতে একখানি সমিৎ বা কাঠ ফেলিয়া দেন। সে কাঠ জ্বলিয়া উঠিলে অগ্নিহোত্র-হবনীর দুধ আহবনীয় অগ্নিতে দুইবার আহুতি দেন। প্রথম আহুতি অগ্নির উদ্দিষ্ট। উহার মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা। দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া বিনা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। সমস্ত দুধ আহুতি দিতে নাই। একটু হবিঃশেষ রূপে থাকে। আহুতিদাতা তাহা ভক্ষণ করেন। আহবনীয়ে আহুতি হইলে গার্হপত্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এবার অগ্নিহোত্রহবনীর দরকার হয় না। ছোট হাতাখানি দিয়া মালসা হইতে কিঞ্চিৎ দুধ লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলিতে হয়। গার্হপত্যে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি গৃহপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথমাহুতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি।

প্রত্যেক আহুতি জলন্ত সমিধের উপর অর্পণ করিতে হয়। আহুতিদানের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটি সমিৎ ফেলিয়া এবং তিন অগ্নির উপস্থান করিয়া গৃহস্থ অগ্নিশালা হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই হইল সায়ংকালের অগ্নিহোত্র। প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্রের বিধি সায়ংকালেরই মত ; কেবল দেবতা অগ্নির বদলে সূর্য্য। আহুতির মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ সূর্য্যোজ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সূর্য্য অস্ত গেলে অনুষ্ঠেয়। প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পর, কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনেক বিতণ্ডার পর সূর্য্যোদয়ের পরেই অগ্নিহোত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন।

অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। গৃহস্থ প্রবাসে থাকিলেও তাঁহার প্রতিনিধি ইহা সম্পাদন করিবেন। এমন কি, বিপত্নীক গৃহস্থেরও অগ্নিহোত্র করিতে হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়। সেখানে অগ্নিহোত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, এই প্রশ্ন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়াছেন। উত্তরে বলিতেছেন, গৃহস্থ যদি পুনরায় বিবাহ না করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র, পৌত্র বা দৌহিত্রকে অনুমতি দিতে পারেন ; সে অনুমতি পাইয়া তাঁহারাই অগ্নিহোত্র চালাইবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আর এক স্থলে প্রশ্ন করিতেছেন, বিপত্নীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে কি করিবে না ? উত্তরে বলিতেছেন, আহরণ করিবে। কেন না, ঋণ পরিহারের জন্য যাগ করিবে, এই শ্রুতি-বচন রহিয়াছে। আপনারাও সেই শ্রুতিবাক্য শুনিয়া থাকিবেন। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যো প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রই তিনটা ঋণে আবদ্ধ হন। ঋষিগণের ঋণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারা, দেবগণের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা, পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা শোধ

করিতে হয়। এরূপে যাহার পুত্র আছে, যে যজ্ঞ করে এবং যে ব্রহ্মচারী, সে ঋণমুক্ত হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সেই দেব-ঋণ মোচনের জন্য অত্যাবশ্যক।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিত্য কর্ম্ম; না করিলেই নয়। অতএব ইহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য হওয়া উচিত। ইহাতে অধিক সময় লাগে না। অধিক সরঞ্জাম বা ব্যয়বিধান আবশ্যক হয় না। যৎকিঞ্চিৎ দুধ থাকিলেই আহুতির কাজ চলিয়া যায়। যদি কোনও কারণে দুধ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটু দধি বা দুটি চাউল বা অন্যকিছু আহুতি দিলেও চলে। যদি কোনও দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও অগ্নিহোত্র বর্জ্জন চলিবে না। অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি—আমি শ্রদ্ধাই আহুতি দিতেছি, এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া শ্রদ্ধা হোম করিবে। এই শ্রদ্ধাহোমের নামান্তর ভাবনা হোম বা মানসিক অগ্নিহোত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক স্থানে বলিতেছেন, শ্রদ্ধাই যজমানের পত্নী স্বরূপ এবং সত্যই যজমান স্বরূপ। শ্রদ্ধা এবং সত্য একযোগে মিথুন হয়। মানসিক অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধা এবং সত্য এই মিথুনের সাহায্যে স্বর্গলোক জয় করা হয়। শ্রদ্ধাহোমে কোনও পার্থিব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কোনরূপ দক্ষিণাও দিতে হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, শ্রদ্ধাহোমে মনুষ্যগণ, দেবগণ, এমন কি সমুদয় জাগতিক দ্রব্যই, দক্ষিণাস্বরূপ। সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান মনুষ্যগণকে দেবতার হস্তে দক্ষিণারূপে অর্পণ করেন। মনুষ্যেরা তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া দেবগণের অধীন হইয়া পড়ে। আর প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান দেবগণকেই দক্ষিণারূপে মনুষ্যের হস্তে অর্পণ করেন, তাই দেবতারা দিনের বেলায় মানুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি হইতে আপনারা অগ্নিহোত্রের মাহাত্ম্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিশালায় অগ্নি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইত এবং সেই অগ্নি যাহাতে নষ্ট বা অশুচি না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কোনরূপে অশুচি ঘটিলে তদনুযায়ী

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় নূতন করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। অগ্ন্যাধ্যান অনুষ্ঠানের কথা আগে বলিয়াছি। অগ্নির পুনরাধান অনুষ্ঠানও তদনুরূপ। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অগ্নি-ভক্তির মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া হয় ত বলিবেন যে, এই অনুষ্ঠান মানুষের আদিম অসভ্য অবস্থার পরিচয় দেয় মাত্র। যে কালে সহজে অগ্নি উৎপাদনের উপায় ছিল না, তখন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যে আগুন রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিত না। এখনও আমাদের পল্লীগ্রামে যেখানে দেয়াশালাইএর বাক্স এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, সেখানে আগুন রক্ষার জন্য মালসা জাগানর প্রথা আছে। মানুষের অসভ্য অবস্থায় এইরূপে অগ্নিরক্ষাটা প্রত্যেক গৃহস্থের religious duty করা হইয়াছিল। নতুবা হঠাৎ আগুনের দরকার হইলে আগুন পাওয়া যাইবে কিরূপে? অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের মূল এইরূপ হইতে পারে। তাহাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। মানুষ নিজে বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে যদি মানুষের লজ্জার বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সভ্য মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানও যদি অসভ্য মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জার কারণ দেখি না। বেদপন্থী সমাজের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেদপন্থী মানুষ অসভ্য ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সে সময়ের অনুষ্ঠানগুলির গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, তৎকালে অন্যরূপ তাৎপর্য্য আরোপিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইত, তাহাই সে কালের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য জীবনের নিয়ামক ছিল। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে সে কালের লোকে কি চোখে দেখিতেন, তাহার পরিচয় আপনারা পাইলেন। আপনারা দেখিলেন, এই গৃহস্থিত অগ্নি যেন সমস্ত গৃহস্থালীর একটা symbol। এই অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া গৃহস্থালী ধৃত ছিল। তিন অগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির

প্রতিনিধিস্বরূপ। এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অন্য পক্ষে দেবগণ এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন। গার্হপত্যের অগ্নি তুলিয়াই আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালা হয়। আহবনীয় অগ্নি দেবগণের মুখ এবং দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের মুখ। এই মুখ দ্বারা তাঁহারা গৃহস্থের নিকট আপনাদের প্রাপ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকেন। বেদপন্থী সমাজের থিয়োরি মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের unit। আর যিনি গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সাময়িক রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। গৃহস্থের পার্থিব জীবন দিন কয়েকের জন্য। তিনি সেই কয়েকটী দিন আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যান, পুত্রপৌত্রাদির উপর গৃহরক্ষার ভার পড়ে। গৃহটাই স্থায়ী। গৃহস্থ পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে গৃহস্থালীর ধারা রক্ষা করেন। গৃহস্থের যে ধনসম্পত্তি, যাহা তিনি দেবগণের বা পিতৃগণের প্রসাদে ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে। তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। পিতৃপিতামহ হইতে তিনি তাহা পাইয়াছেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিকে তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য আছেন। সেই ধনসম্পত্তি নষ্ট করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কেন না, তিনি উহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। সেই পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের জীবনে তিনি ভোগ করেন বলিয়াই তিনি অন্ততঃ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করেন এবং আপনার জীবনান্তে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, এই তিন পুরুষের নিকট পিণ্ডের দাবী করেন। এই দক্ষিণাগ্নিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে গৃহস্থের পক্ষে কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে লওয়া যাইতে পারে না। এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অগ্নির দ্বারাই গৃহস্থের সহিত সমাজের

সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ধনসম্পত্তি ভোগে অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই সমাজের অন্যান্য গৃহস্থের সহিত তাঁহার আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য পায়, এবং তাঁহাকে সাহায্য দেয়। এইরূপে রাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ঘটে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের এই symbolic তাৎপর্য্য থাকাতেই ইহা গৃহস্থ জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বপ্রধান নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত, তাহাতে সংশয়ের হেতু দেখি না।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমার ততটুকু বিদ্যা নাই। সুধীজনের সম্মুখে সেই কয়েকটি প্রশ্ন আমি উপস্থাপিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। আচার্য্যগৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ঘরে না ফিরিলে গৃহধর্ম্মে অধিকার জন্মিত না এবং পত্নী-গ্রহণে অধিকার জন্মিত না, ইহা নিশ্চয়। পত্নী গ্রহণ না করিলে অগ্ন্যাধানে অধিকার জন্মিত না, এবং অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার জন্মিত না। কিন্তু বিবাহ করিলেই অগ্ন্যাধান করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল কি না? পিতা বর্ত্তমানে পুত্র ঘরে ফিরিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি আপনার জন্য অগ্ন্যাধানে বাধ্য ছিলেন কি না? যদি ধরা যায়, যে পুত্রও পিতৃগৃহে থাকিয়া নিজের জন্য পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে একই গৃহমধ্যে একাধিক অগ্নিশালার প্রয়োজন হয়। একই গৃহে একাধিক অগ্নিশালা থাকিতে পারিত কি না? তাহা সম্ভব হইলে আমি উপরে যে থিয়োরি দিলাম, তৎসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে। হইতে পারে, বিবাহিত পুত্রের পিতা বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। হয় ত পিতা বর্ত্তমানে তাঁহাকে কোনও শ্রৌত কর্ম্মই করিতে হইত না। যদি বা কোনও কর্ম্ম করিতে হইত, তাহা পিতার অনুমতি লইয়া পিতার অগ্নিতেই সম্পাদন করিতে পারিতেন। পুত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পিতার অগ্নিতে

অগ্নিহোত্র করিবেন, পিতা প্রবাসে থাকিলে অগ্নিহোত্র বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন, এরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন মনে করা যাইতে পারে, পুত্র বিবাহিত হইলেও তাঁহার পক্ষে পৃথক্ অগ্নি স্থাপন না করিলেও চলিতে পারিত। তাহার পক্ষে পৃথক্ শ্রৌতকর্ম্ম না করিলেও চলিতে পারিত। আবার নিতান্তই যদি তিনি পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে পৃথক্‌ভাবে শ্রৌতকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ গৃহে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতিতেন। সেই খানে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আপনার জন্য অগ্নি-স্থাপনা করিতেন। পিতা বর্ত্তমানে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতা সে কালে প্রথা ছিল কি না, এবং ঐ প্রথা বিধি-সঙ্গত ছিল কি না, তাহা আমি জানি না। হিন্দু আইনে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রচলিত আছে। যে কালের কথা আমি কহিতেছি, সে কালে এরূপ একান্নবর্ত্তী গৃহস্থালী কিরূপে প্রচলিত ছিল, সে প্রশ্ন এই সঙ্গে উপস্থিত হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার সমীপেই বাস করিবেন এবং তাঁহার অধীন থাকিবেন; পিতার দেহান্তের পর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ গৃহস্থালী স্থাপন করিতে পারেন; একান্নবর্ত্তী পরিবারের ইহাই নিয়ম। আপনারা patriarchal familyর—পিতৃতন্ত্র গৃহস্থালীর—কথা জানেন। এই প্রথামতে গৃহপতি পিতাই পুত্রগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। পুত্রগণ তাঁহার ভৃত্যমাত্র; সর্ব্বতোভাবে অধীন ভৃত্য মাত্র। পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রদের বধদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে পিতার এতটা ক্ষমতা বোধ করি ছিল না। পুত্র জন্মিবামাত্র পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাহার একটা ভাবী স্বত্ব জন্মিত। পিতা সেই স্বত্বে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। কেন না, পৈত্রিক সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব

নহে, উহা সেই গৃহের সম্পত্তি; তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা—trustee—মাত্র। কাজেই পুত্রগণের উপর পিতার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। এরূপ স্থলে পিতা বর্ত্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পাইতেন, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। পিতা বর্ত্তমানে পৃথক্ ভাবে গৃহস্থালী পাতিয়া পৃথক্ ভাবে অগ্ন্যাধান করিয়া শ্রৌতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুত্রের স্বাধীনতা কত দূর ছিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। যদি বা পুত্র সেইরূপ স্বাধীনতা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পৈত্রিক দায়াধিকারে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটিত কি না, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থিত হয়। আমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী দুই চারি জন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ভাল উত্তর পাই নাই। আপনাদের নিকটে প্রশ্ন কয়টি উপস্থাপিত করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় আমি ক্ষান্ত থাকিলাম।

অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্রের বিবরণ দিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম। ইষ্টি যাগ, পশু যাগ এবং সোম যাগ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ লইয়া পরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদপন্থীর জাতীয় জীবনে ইহার তৎপরতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

---

# ইষ্টি যাগ ও পশু যাগ।

এক শ্রেণীর শ্রৌত যজ্ঞের নাম ইষ্টি যাগ। আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইত। যাবজ্জীবন করাই বিধি; ন্যূন পক্ষে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিতে হইত। অমাবস্যার ইষ্টি যাগের নাম দর্শ যাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টি যাগের নাম পূর্ণমাস যাগ। উভয় যজ্ঞেরই বিধিবিধান প্রায় একরূপ। আমি

কেবল পূর্ণমাস যাগের বিবরণ দিব। পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠানটি আয়ত্ত হইলে যাবতীয় ইষ্টি যাগের অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যাইবে। যাজ্ঞিকের ভাষায় পূর্ণমাস যাগ যাবতীয় ইষ্টি যাগের প্রকৃতি বা model ; আর আর ইষ্টি যাগ তাহার বিকৃতি। পূর্ণমাস যাগের বিধি সকল ইষ্টি যাগেই প্রযোজ্য ; কেবল ক্ষেত্রভেদে বিশেষ বিধি রহিয়াছে।

পূর্ণমাস যাগ প্রত্যেক পূর্ণিমায় সম্পাদ্য। এই যজ্ঞে প্রধান আহুতি দুইটি। প্রথম আহুতি অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট। যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া যায়, তাহার নাম পুরোডাশ। এই পুরোডাশ যবের অথবা চাউলের রুটিমাত্র। যব অথবা চাউল বাঁটিয়া আগুনে সেকিয়া এই রুটি প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই পুরোডাশ প্রস্তুত করেন। কয়েক মুঠা যব অথবা ব্রীহি ধান লইয়া তাহা উখুলে রাখিয়া কাঁড়িতে হয় ; তার পর কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া তুষ ও ক্ষুদ কুঁড়া পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয় ; তাহার পর শিলে বাঁটিয়া পিটুলি তৈয়ার হয়। এই পিটুলি আগুনে সেকিয়া রুটি বা পুরোডাশ তৈয়ার হইবে। সেকিবার জন্য কয়েক খানি ছোট ছোট মাটির খোলা বা কপাল থাকে। খোলাগুলি চতুষ্কোণ ; কতকগুলির কোণ ভাঙ্গিয়া ও ঘসিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার করিয়া লওয়া যায়। চতুষ্কোণ খোলা মাঝে রাখিয়া তাহার চারিপাশে কোণহীন খোলাগুলি সাজাইয়া বসাইতে হয় ; মাঝে যেন ফাঁক না থাকে। অগ্নির উদ্দিষ্ট প্রথম পুরোডাশের জন্য আটখানি খোলা এইরূপে সাজাইতে হয় ; ইহার নাম অষ্টাকপাল পুরোডাশ। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় পুরোডাশের জন্য এগার খানি খোলা সাজাইতে হয় ; ইহার নাম একাদশকপাল পুরোডাশ। গার্হপত্যের আগুনে খোলাগুলি তপ্ত করিয়া তাহার উপরে সেই যবের বা চাউলের পিটুলি ঢালিয়া দিয়া গার্হপত্যের অঙ্গারেই সেকিতে হয়। এই-রূপে পুরোডাশ তৈয়ার হইলে তাহাতে ঘি মাখাইয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যথাকালে এই পুরোডাশ আহুতি দিতে হইবে।

সমুদয় কৰ্ম্ম অধ্বর্য্যু স্বহস্তে সম্পাদন করেন। প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট যজুর্মন্ত্র থাকে।

প্রধান যাগের কথা বলিলাম। প্রধান যাগের পূর্ব্বে এবং পরে কর্ম্মাঙ্গস্বরূপে আরো কতকগুলি অপ্রধান যাগ করিতে হয়। কতকগুলি হোমও করিতে হয়। যাগের সহিত হোমের পার্থক্য আছে। যাগকালে আহুতি দেন অধ্বর্য্যু; কিন্তু মন্ত্র পাঠ করেন আর এক জন ঋত্বিক্, তাঁহার নাম হোতা। হোতা দেবতা আহ্বান করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের পর বৌষট্ শব্দ উচ্চারণ করেন, ইহার নাম বষট্কার। এই বষট্-কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। তাঁহাকে কোনও মন্ত্র পড়িতে হয় না। ইহারই নাম যাগ। আর হোম অনেকটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। ইহাতে হোতার দরকার হয় না। অধ্বর্য্যু অগ্নির পাশে বসিয়া নিজেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন; মন্ত্রের পর স্বাহা উচ্চারণ করেন। ইহার নাম স্বাহাকার। স্বাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন। ইহাই হইল হোম। পূর্ণমাস যজ্ঞে প্রধান যাগের পূর্ব্বে বা পরে যে সকল অপ্রধান যাগ বা হোম করিতে হইত, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

পূর্ণমাস যাগে চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। প্রথম অধ্বর্য্যু; পুরোডাশ প্রস্তুত করা হইতে আহুতি দান পর্য্যন্ত সমুদায় কাজই অধ্বর্য্যুর। মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র-সাহায্যে ইঁহাকে কাজ করিতে হইত; এইজন্য ইনি যজুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ। এই হিসাবে অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্গণের মধ্যে প্রধান। তিনি অধ্বরের অর্থাৎ যজ্ঞের যেন দেহ নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় ঋত্বিকের নাম হোতা। ইনি মন্ত্র পড়িয়া আহুতির পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান করেন। হোতা শব্দ হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। দেবতাকে আহ্বান করেন বলিয়া ইঁহার নাম হোতা। হোতার পাঠ্য অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্ মন্ত্র। এইজন্য হোতার ঋগ্বেদে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। ইষ্টি যাগে সাম গানের

প্রয়োজন হয় না। সে জন্য উদ্গাতার বা অন্য সামগায়ী ঋত্বিকের দরকার হয় না। তৃতীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ইনি অধ্বর্য্যু এবং হোতা উভয়েরই উপরে। উভয়ের কর্ম্ম পরিদর্শন করেন; ভ্রান্তি ঘটিলে সংশোধনের ব্যবস্থা দেন। চতুর্থ ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ; ইনি ব্রহ্মার সহকারী। এই চারিজন ঋত্বিক্‌কে পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পূর্ণমাস যাগ আরম্ভ করিতে হয়।

যাগের পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্ণের ক্রিয়া অন্বাধান এবং অপরাহ্ণের ক্রিয়া ব্রত-গ্রহণ। পূর্ব্বাহ্ণে যজমান গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নিতে এক এক খানি সমিৎ ফেলিয়া যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে অনুকূল করিয়া রাখেন। অগ্নিকে যেন বলিয়া রাখা হয়, কাল আমি যাগ করিব, এখন হইতে তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক। অপরাহ্ণে যজমান ক্ষৌরকার্য্যের পর স্নানান্তে কিছু খাইয়া লন; পরে অগ্নির পাশে দাঁড়াইয়া, আমি সত্য কথা কহিব, ইত্যাদি কতিপয় নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা করেন। এই কর্ম্মের নাম ব্রত-গ্রহণ। পত্নীর সহিত যজমান অগ্নিশালাতেই শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করেন।

পরদিন প্রাতে অগ্নিহোত্র সমাপনের পর ইষ্টি যাগ। যজমানের প্রথম কাজ ব্রহ্মার বরণ। বরণের পর ব্রহ্মা আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করেন, এবং সেখানে বসিয়াই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিদর্শন করেন। ব্রহ্মার বাম দিকে যজমানের বসিবার স্থান। যজমানের পত্নী গার্হপত্যের দক্ষিণে বসেন। তিনি যখন গৃহিণী, তখন গার্হপত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। বেদির উত্তর দিকে হোতার এবং অগ্নীতের আসন। অধ্বর্য্যু যাগ-কালে বসিতে পান না; তাঁহাকে নানা কর্ম্মে এখানে ওখানে ঘুরিতে হয়।

বরণের পর ব্রহ্মা স্বস্থানে বসিলে প্রণীতা-প্রণয়ন কর্ম্ম হয়। প্র উপসর্গের অর্থ সম্মুখে—পূর্ব্ব মুখে; প্র-ণয়ন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব মুখে লইয়া যাওয়া। খানিকটা জল পূর্ব্ব মুখে লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে স্থাপন করা

হয়। আগে বলিয়াছি, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান। এই জলের নাম প্রণীতা। সংস্কৃত ভাষায় অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সেইজন্য প্রণীত বিশেষণটা স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত। যাগশেষ পর্য্যন্ত সেই জল সেইখানে থাকে। তাৎপর্য্য, উহা স্বস্থানে থাকিয়া যজ্ঞকে রক্ষা করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, জল অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষে বজ্রস্বরূপ; উহারা সেই বজ্র দেখিলে যজ্ঞভূমিতে আসে না। এদিকে অধ্বর্য্যু যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করিয়া গোছাইয়া রাখেন এবং যথাকালে বেদির উপর সাজাইয়া রাখেন। ইষ্টি যাগে অনেকগুলি সরঞ্জামের দরকার হয়। কতকগুলি সরঞ্জামের নাম জানা আবশ্যক। শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। (১) যজ্ঞিয় কাঠের কতকগুলি টুকরা দরকার হয়, এই কাষ্ঠ খণ্ডের নাম সমিৎ। তিন খানি সমিধে আহবনীয় অগ্নিকে ঘেরিয়া বেড়া দিতে হয়। এই তিন খানির নাম পরিধি। আর কয়খানি সমিৎ যাগের পূর্ব্বে আগুন জ্বালাইবার জন্য পৃথক্ থাকে। আগুন জ্বালানর নাম সমিন্ধন। অধ্বর্য্যু একখানি সমিৎ আহবনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, আর হোতা এক একটি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করেন। অগ্নি-সামন্ধনের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই মন্ত্রের নাম সামিধেনী ঋক্। (২) কয়েক আঁটি দর্ভের বা কুশের প্রয়োজন। বেদির উপরে এই কুশগুলি বিছাইয়া তাহার উপর যাগের সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া রাখিতে হয়। কুশের একটা আঁটি পৃথক্ বাঁধা থাকে, তাহার নাম প্রস্তর। যে হাতায় আহুতির দ্রব্য লইয়া আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাম জুহূ। জুহূখানি ঐ প্রস্তরের উপরে রাখিতে হয়। এই প্রস্তর নিতান্ত সামান্য বস্তু নহে। উহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, সে কথা পরে বলিব। (৩) পূর্ণমাস যজ্ঞে প্রধান যাগে পুরোডাশ আহুতি হয়। তাহার পূর্ব্বে এবং পরে অপ্রধান যাগগুলিতে আজ্যাহুতি হয়। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য সংস্কৃত ঘৃতের নাম আজ্য। একটা মাটির মালসায় এই আজ্য থাকে, তাহার

নাম আজ্যস্থালী। আজ্যস্থালী হইতে আজ্যগ্রহণের জন্য চারি খানি কাঠের হাতার দরকার। একখানির নাম ধ্রুবা। বেদির উপর স্থিরভাবে থাকে বলিয়া উহার নাম ধ্রুবা। আজ্যস্থালীর আজ্য ধ্রুবাতে ঢালিতে হয় এবং যাগের সময়ে সেই ধ্রুবা হইতেই আজ্য লওয়া হয়। ধ্রুবা হইতে আহুতির জন্য আজ্য গ্রহণের একখানি ছোট হাতা থাকে ; সেখানির নাম স্রুব। আর একখানি বড় হাতা থাকে, সেই খানি জুহু। জুহুর নাম আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আহুতির সময় অধ্বর্য্যু ছোট স্রুবের দ্বারা ধ্রুবা হইতে আজ্য তুলিয়া লন এবং জুহুতে ঢালিয়া দেন। চতুর্থ হাতার নাম উপভৃৎ; ইহা জুহুর চেয়ে ছোট। যাগের সময় অধ্বর্য্যু ডানি হাতে জুহু এবং বাম হাতে উপভৃৎ গ্রহণ করেন। উপভৃৎ খানি জুহুর নীচে থাকে। উদ্দেশ্য যে, জুহুস্থিত আহুতি দ্রব্য যেন ভূমিতে না পড়ে ; দৈবাৎ পড়িলে যেন উপভৃতেই পড়ে। (৪) পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি সরঞ্জাম আবশ্যক। যথা (ক) অগ্নিহোত্রহবনী—ইহার কথা অগ্নিহোত্র-প্রসঙ্গে বলিয়াছি ; ইষ্টি যাগে সেই অগ্নিহোত্রহবনী পুরোডাশার্থ যব বা ধান আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (খ) উদূখল মুষল—সেই যব বা ধান উখুলে রাখিয়া মুষল প্রয়োগে কাঁড়া যায়। (গ) শূর্প বা কুলা,—ধান ঝাড়িয়া তুষ পৃথক্ করিবার জন্য আবশ্যক। (ঘ) দৃষৎ ও উপল অর্থাৎ শিল ও নোড়া, চাউল বাঁটিবার জন্য আবশ্যক। (চ) শম্যা, একখানা কাঠ ; চাউল বাঁটিবার সময় নীচে এই কাঠ খানা পাতিলে শিলখানা ঢালু হয় ও চাউল বাঁটার সুবিধা হয়। (ছ) কৃষ্ণাজিন অর্থাৎ কাল হরিণের চামড়া ; চাউল কাঁড়িবার সময় উদূখলের নীচে ও বাঁটিবার সময় শিলের নীচে পাতা থাকে।

অধ্বর্য্যু বেদির উপর কুশ বিছাইয়া ঐ সকল সরঞ্জাম সাজাইয়া ফেলেন। তার পর যাগের জন্য আহবনীয় অগ্নি ভাল করিয়া জ্বালিতে হয়—ইহাই অগ্নি-সমিন্ধন ; ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হোতা এক

একটি সামিধেনী ঋক্ পাঠ করেন, আর অধ্বর্য্যু এক একখানি সমিৎ আহবনীয়ে ফেলিয়া দেন; আহবনীয় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

যজ্ঞের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে; পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখা হইয়াছে; আহবনীয় অগ্নি জ্বালান হইয়াছে এখন যাগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। দেবতাদের আহ্বান হোতার কাজ। কিন্তু হোতা সামান্য মানুষ; তাঁহার ডাকে দেবতারা আসিবেন কেন? আগেই বলিয়াছি, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের হোতা। অগ্নি স্বয়ং ডাকিলে তবে দেবতারা আসিবেন; অগ্নিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু অগ্নিকেই বা ডাকিবে কে? অধ্বর্য্যু ডাকিবেন; হোতাও ডাকিবেন। তাঁহাদের আহ্বানই বা অগ্নি শুনিবেন কেন? প্রাচীন ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন; অলৌকিক ক্ষমতাবলে মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রে তাঁহারা অগ্নিকে ডাকিতেন; তাঁহাদের ডাক অগ্নি শুনিতেন। যজমান যে গোত্রে জন্মিয়াছেন, সেই গোত্রে পূর্ব্বকালে যে কয়জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপন আপন মন্ত্রে আপন আপন অগ্নিকে ডাকিতেন। অগ্নি নিশ্চয়ই তাঁহাদের ডাক শুনিতেন সেই ঋষিগণের অগ্নির নাম আর্ষেয় অগ্নি বা ঋষি সম্বন্ধীয় অগ্নি; নামান্তর প্রবর অগ্নি। দেবতা আহ্বানের জন্য তৎপূর্ব্বে হোতাকে বরণের নাম প্র-বরণ। যজমানের নিযুক্ত হোতা মানুষ হোতা মাত্র; কিন্তু অগ্নি দেবহোতা। মানুষ হোতাকে যেমন পূর্ব্বে বরণ অথবা প্রবরণ করিতে হয়, দেবহোতা অগ্নিকেও সেইরূপ প্রবরণ করিতে হয়। যজমানের গোত্রের প্রবর্ত্তক প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিয়া ডাকিলে সেই ঋষিদিগের অগ্নি সেই ডাক শুনিতে পারেন। অতএব সেই ঋষিদিগের নামানুসারে দেব হোতা অগ্নিকে ডাকিয়া পরে সেই অগ্নিরই প্রতিনিধি-স্বরূপে মানুষ হোতাকে বরণ করা হয়। এইরূপে নিয়োগ পাইয়া মানুষ হোতা সেই পূর্ব্ব ঋষিগণের অগ্নিকে আহ্বান করেন এবং সেই অগ্নিকেই মন্ত্রদ্বারা

দেবতা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করেন। বরণান্তে হোতা বেদির উত্তরে স্বস্থানে আসন গ্রহণ করেন।

এখন প্রকৃত পক্ষে যাগ আরম্ভ হয়। যাগগুলির নাম একে একে করিব। (১) প্রযাজ যাগ, প্রধান যাগের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রযাজ। আহুতির দ্রব্য আজ্য। অধ্বর্য্যু ঘৃতধারা দ্বারা আঘার হোম করিয়া পরে প্রযাজ যাগ করেন। পাঁচ দেবতার উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়। দেবতাদের নাম শুনিলে অপনারা চম্‌কিয়া উঠিবেন। এখনও আমরা বেদপন্থী বলিয়া পরিচয় দিই বটে; কিন্তু এই দেবতাদের নাম একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথম দেবতা সমিৎ; দ্বিতীয় দেবতা তনূনপাৎ, অথবা যজমানের গোত্রভেদে নরাশংস; তৃতীয় দেবতা ইড়ঃ; চতুর্থ দেবতা বর্হিঃ; পঞ্চম দেবতা স্বাহাকার। (২) পঞ্চ প্রযাজের পর অগ্নির উদ্দেশে একবার এবং সোমের উদ্দেশে একবার আজ্য আহুতি, ইহার নাম আজ্যভাগ-দান। (৩) আজ্যভাগ দানের পর প্রধান যাগ। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম পুরোডাশ, এবং তৎপরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে দ্বিতীয় পুরোডাশ দান। দুইয়ের মাঝে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একটু ঘৃতাহুতি দিতে হয়। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে মন্ত্র পাঠ হয়, বলিয়া এই ঘৃতাহুতির নাম উপাংশু যাগ। (৪) তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ যাগ। পুরোডাশ দুই খানির সমস্তটা আহুতি দিতে হয় না; খানিকটা রাখিতে হয়। ইহারই কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ রুদ্র দেবতার মূর্ত্তি। এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহার বাণকে সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র, ভীম, কপর্দ্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন। ইহাঁকে খুসী রাখিবার জন্য কখন কখন শঙ্কর বলা হইত। ফলে, বেদপন্থীদের অন্যান্য দেবতাদের সহিত ইহাঁর পার্থক্য ছিল। ইনি একবার দেবতাদের অনু-

রোধে স্বয়ং প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া ইহাঁকে পশুগণের আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না; জোর করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি স্বিষ্টকৃৎ যাগের প্রচলন। স্বিষ্টকৃৎ যাগে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা রুদ্রদেবই অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ মূর্ত্তিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-ঘটিত পৌরাণিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে। (৫) স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর অনুযাজ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে যেমন প্রযাজ, পরে তেমনই অনুযাজ। প্রযাজ যাগের পাঁচ দেবতা; অনুযাজের তিন দেবতা—বর্হিঃ, নরাশংস, এবং পুনরায় অগ্নি, স্বিষ্টকৃৎ। আহুতির দ্রব্য আজ্য।

প্রধান অপ্রধান এই সমুদায় যাগের সম্পাদনে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। আগে বলিয়াছি অধ্বর্য্যুই যাগকর্ত্তা; হোতা দেবতার আহ্বানকারী মাত্র। আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া যাগ হয়। অধ্বর্য্যুর আসন আহবনীয়ের উত্তরে; সেইখানে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। যে কোনও যাগের পূর্ব্বে তিনি ডানি হাতে জুহূ এবং বামহাতে উপভৃৎ লইয়া বেদির উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া আসেন। দক্ষিণে দাঁড়াইয়া তিনি অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক্‌কে আদেশ দেন—"ওঁ শ্রাবয়" অর্থাৎ দেবতাদিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুরোধ কর। অগ্নীৎ বেদির উত্তরে একখানি কাঠের তলওয়ার তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই তলোয়ার খানির নাম স্ফ্য। তিনি উত্তরে বলেন—"অস্তু শ্রৌষট্" অর্থাৎ আচ্ছা, দেবতারা শুনিতেছেন। তখন অধ্বর্য্যু হোতাকে দেবতার আহ্বানে আদেশ দেন। হোতাকে দুইটি মন্ত্র পড়িতে হয়। প্রথমটির নাম অনুবাক্যা; ইহা ঋক্ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অনুকূল করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের নাম যাজ্যা; এই মন্ত্র কখন ঋক্, কখন যজুঃ। ইহাই যাগের মন্ত্র, এইজন্য নাম যাজ্যা; মনে করুন, যাগের দেবতা অগ্নি। হোতা মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে

"যে যজামহে অগ্নিং দেবম্"—বলিয়া আরম্ভ করেন। এই টুকুর নাম আগূঃ। তৎপরে যাজ্যা মন্ত্র পড়িয়া বলেন—"অগ্নে বীহি বৌষট্"—অগ্নি ইহা ভক্ষণ করুন এবং দেবতার নিকট বহন করুন। ঐ বৌষট্ উচ্চারণই বষট্‌কার। ঐ বষট্‌কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য আজ্যই হউক, আর পুরোডাশই হউক, অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। যজমান আহুতির পর ত্যাগ মন্ত্র বলেন। "ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম"—এই দ্রব্য অগ্নিকে দেওয়া হইল, আমার থাকিল না—ইহাই ত্যাগমন্ত্র। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নামই যাগ। যজমান এইরূপে দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। ত্যাগ মন্ত্র পাঠের পর অধ্বর্য্যু অগ্নির দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যেক যাগেরই এই সাধারণ বিধি।

একটা বড় কথা বলিতে বাকি আছে। উহা হবিঃশেষভক্ষণ। হবিঃশেষ না খাইলে কোনও যজ্ঞই সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সমস্ত দুধটা আহুতি দেওয়া হয় না; একটু শেষ থাকে, তাহা খাইতে হয়। পূর্ণমাস যাগেও সমস্ত পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয় না। খানিকটা পুরোডাশ রাখিয়া দিতে হয়। যজমান এবং ঋত্বিকেরা উহা ভক্ষণ করেন। এইজন্য পুরোডাশের শেষ অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র; ইহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ডের নাম ষড়বত্ত; এই খণ্ড অগ্নীতের। আর এক খণ্ড চারি টুকরা করিয়া অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীৎ এই চারি জনে প্রত্যেকেই ভক্ষণ করেন। পুরোডাশের আর দুই খণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রহ্মা এবং যজমান ঐ দুই খণ্ড ভক্ষণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় পুরোডাশের কিয়দংশ ঘৃতাক্ত করা হয়। এই অংশের নাম ইড়া। যজমান এবং চারিজন ঋত্বিক্, সকলে মিলিয়া এই ইড়া ভক্ষণ করেন। এই ইড়া-ভক্ষণ একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। এখন আমি ইহার

সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু আপনারা এই ইড়াকে মনে রাখিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে। ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝা হইবে না। এই ইড়ারই আবার একটি অংশ হোতা পৃথক্ ভাবে ভক্ষণ করেন। এই অংশের নাম অবান্তর ইড়া। এই হবিঃশেষ-ভক্ষণানুষ্ঠান স্বিষ্টকৃৎ যাগের পরে এবং অনুযাজ যাগের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল ব্রহ্মা ও যজমানের ভাগ যজ্ঞসমাপ্তির জন্য রক্ষিত থাকে।

অনুযাজ যাগের সহিত পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি এক রকম সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন সমাপ্তিতে পৌছিতে হইবে। প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টির কথা আপনাদের মনে থাকিবে। এক মুষ্টি কুশ বাঁধিয়া বেদির উপর রাখা হইয়াছিল, উহারই নাম প্রস্তর। কিন্তু এই প্রস্তর কেবল কুশের গোছা নহে। ইহাতে যজমানের শরীর কল্পনা করা হয়। অনুযাজ যাগের পর প্রস্তর আহবনীয়ের আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তর যখন আগুনে পুড়িতে থাকে, যজমান তখন স্বর্গে যাইতেছেন বুঝিতে হইবে। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে, যজমান স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সহিত মিশিয়াছেন। প্রস্তর পুড়িবার সময় অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা লইয়া হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম সূক্তবাক্। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে আশীর্ব্বাদসূচক আর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম শংযুবাক্। আপনাদের মনে থাকিবে, যজ্ঞের আরম্ভে তিন খানি সমিৎ কাষ্ঠ দিয়া আহবনীয় অগ্নিকে ঘেরিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই সমিৎ কয়খানির নাম পরিধি। মানুষ হোতা দেব হোতা অগ্নিকে আহবনীয় স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের মনে আছে। এই পরিধি তিন খানি সেই দেব হোতার শরীর। এখন এই পরিধি কয়খানি অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়; দেবহোতা যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যান। এই সময়ে অধ্বর্য্যু বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে একটু আজ্য দিয়া হোম করেন; ইহার নাম

সংস্রব হোম। ইহা যাগ নহে, হোম। এই হোমের সহিতই যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এতক্ষণ আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। আমিও এখানে সমাপ্তি দিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম, কিন্তু যাজ্ঞিকেরা অব্যাহতি দিবেন না। যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। কিন্তু যজমানের পত্নীর পক্ষে এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, গার্হপত্য অগ্নির সহিত যজমানের পত্নীর বিশেষ সম্পর্ক। গার্হপত্যের পাশে তিনি এতক্ষণ বসিয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত যত যাগ হইয়াছে, সমস্তই আহবনীয় অগ্নিতে হইয়াছে; গার্হপত্যে কোনও যাগ হয় নাই। এখন ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন জন ঋত্বিক্ যজমান পত্নীর নিকটে আসিয়া কয়েকটি আহুতি দেন; গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দেন। আহুতির দ্রব্য আজ্য। দেবতা যথাক্রমে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ এবং অগ্নি গৃহপতি। অগ্নি গৃহপতি ত গার্হপত্য অগ্নির দেবতা। অগ্নি গৃহপতি যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইলে, গৃহিণী তাহা সহিবেন কেন? আর দেবপত্নীগণকেও বঞ্চিত হইতে তিনি দিবেন কেন? প্রধান যাগের পর যেমন হবিঃশেষ ভক্ষণ হইয়াছিল, গৃহপত্নীর পক্ষে এই যাগের পরও হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতে হয়। ভক্ষণের পর সূক্তবাক্ পঠিত হয় না বটে, তবে শংযুবাক্ পাঠ করিতে হয়, এবং সংস্রব হোমও করিতে হয়। যজমান-পত্নীর পক্ষে এই যাগের নাম পত্নী-সংযাজ।

দক্ষিণাগ্নি এ পর্য্যন্ত কোন আহুতিই পান নাই। অধ্বর্যু দক্ষিণাগ্নিতে এখন একটু আজ্য হোম করেন। পুরোডাশ তৈয়ার করিবার সময় পিটুলির যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া হয়। দেবহোতার আহ্বানে যে সকল দেবতা যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও যজ্ঞস্থল হইতে যান নাই। অধ্বর্যু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সকলের জন্য আহবনীয় অগ্নিতে একটু আজ্য অর্পণ করেন। তখন তাঁহারা চলিয়া যান। ইহার নাম

সমিষ্ট-যজুর্হোম। বেদির উপরে যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি রাখিবার জন্য যে সকল কুশ বিছান হইয়াছিল, তাহাও আহবনীয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যজ্ঞারম্ভে প্রণীতা নামক জল প্রণয়ন করিয়া যজ্ঞরক্ষার জন্য আহবনীয়ের পূর্ব্ব দিকে রাখা হইয়াছিল; যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, এখন সেই জল বেদির উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। পুরোডাশের জন্য চাউল ঝাড়িয়া যে তুষ ও ক্ষুদের গুঁড়া অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাক্ষসদের প্রাপ্য। ইহাতেই তাহারা খুসী হইবে। রাক্ষসদের উদ্দেশে ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইবারে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজমান এখন দেবত্ব পাইয়াছেন; এমন কি, দেবগণের মধ্যে পরম দেবতা যে বিষ্ণু, তিনি সেই বিষ্ণুপদের প্রার্থী। আপনারা জানেন, বিষ্ণু ত্রিপাদদ্বারা তিন লোক আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য বিষ্ণুর এই ত্রিপাদাক্রমণের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পূর্ণ। তদনুকরণে যজমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব্ব মুখে আহবনীয় পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থল প্রক্রমণ করেন, ইহার নাম বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ। পূর্ব্বদিকে দেবতাদের স্থান; যজমান পূর্ব্ব দিকে তাকাইয়া বলেন, আমি জ্যোতিতে গমন করিয়াছি; জ্যোতির সহিত আমি মিলিত হইয়াছি। পরে যজমান সূর্য্যের এবং গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া প্রার্থনা করেন, "হে গৃহপতি অগ্নি, আমি যেন তোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই"; পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমার এই পুত্র এই বীর কর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক।" তৎপরে আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করিয়া যজ্ঞের পূর্ব্ব দিন যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিসর্জ্জন করেন। বিসর্জ্জনের পর যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া যজমান এবং ব্রহ্মা পুরোডাশের যে ভাগ তাঁহাদের জন্য রক্ষিত ছিল, তাহা ভক্ষণ করেন। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা আহবনীয় সমিৎ দিয়া পূর্ণমাস ইষ্টি সমাপ্ত করিয়া দেন। যজ্ঞান্তে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণমাস যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনী দরিদ্র

সকলকেই ইহা করিতে হইবে। দক্ষিণা ব্যয়সাধ্য হইলে চলিবে না। যজ্ঞের আরম্ভে দক্ষিণাগ্নিতে চারিজন ঋত্বিকের উপযুক্ত ভাত চড়াইয়া দেওয়া হয়। উহা দক্ষিণাগ্নিতেই পক্ক হয়। এই অন্নই দক্ষিণা; যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করেন; ইহাতেই যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হয়।

পূর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ দিলাম। ইহাতেই ইষ্টি যাগ জিনিসটা কি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। এখন পশুযাগের কথা বলিতে চাহি। পশুযাগ নানাবিধ। তাহার মধ্যে একটি পশুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার নাম নিরূঢ় পশুবন্ধ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই যাগ কর্ত্তব্য। কাহার মতে বৎসরে দুই বার কর্ত্তব্য; উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে। এই পশুযাগ অন্য যাবতীয় পশুযাগের প্রকৃতি। ইহারই বিবরণ দিলে সকল পশুযাগেরই মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে।

ইষ্টিযাগে চারি জন ঋত্বিক্ আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ। পশুযাগে আরো দুই জন আবশ্যক। এক জন অধ্বর্য্যুর সহকারী, তাঁহার নাম প্রতিপ্রস্থাতা। আর এক জন হোতার সহকারী; তাঁহার নাম মৈত্রাবরুণ। এই ছয় জন ঋত্বিক্ লইয়া পশুযাগ আরম্ভ করিতে হয়। ইষ্টি যাগে যজ্ঞের সরঞ্জাম রাখিবার জন্য যে বেদি থাকে, সেই বেদির পশ্চিমে থাকে গার্হপত্য এবং পূর্ব্বে থাকে আহবনীয়। পশু-যাগে আরও একটি বেদিনির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম পাশুক বেদি। আহবনীয় অগ্নিরও পূর্ব্ব দিকে এই বেদি নির্ম্মিত হয়। এই পাশুক বেদিরও উপরে আরও একটি ছোট বেদি তুলিতে হয়; তাহার নাম উত্তরবেদি। যজ্ঞশালার উত্তর দিকে মাটি তুলিয়া সেই মাটিতে উত্তর বেদি গড়া হয়। মাটি তুলিলে যে গর্ত্ত হয়, সে গর্ত্তের নাম চাত্বাল। চাত্বালের কাছে পাশুক বেদির ধূলি আবর্জ্জনা স্তূপাকৃতি করিয়া রাখা হয়। ঐ স্তূপের নাম উৎকর। উত্তর বেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখা হয়। নাভিস্থিত সেই অগ্নিতে আবার

নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিতে হয়। অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিমন্থন দ্বারা এই নূতন অগ্নি উৎপাদিত হয়। নাভিতে এই দুই অগ্নি মিশাইলে তদবধি এই অগ্নিই নূতন আহবনীয় রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পুরাতন আহবনীয় আপনার মর্য্যাদা হারাইয়া তদবধি গার্হপত্যের কাজ করে। পাশুক বেদির উপরে পশুযাগের উপযুক্ত সরঞ্জাম এবং আহুতির দ্রব্য রাখিতে হয়।

পশুবন্ধনের জন্য যূপের দরকার। এই যূপ কাঠের স্তম্ভমাত্র। অধ্বর্য্যু স্বয়ং ছুতারের সহিত বাহিরে গিয়া গাছের ডাল কাটিয়া আনেন। উহার ডালপালা ছাঁটিয়া অষ্ট কোণ স্তম্ভ বা খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। যূপ অন্যূন পাঁচ হাত দীর্ঘ হয়; হাতখানেক মাটির নীচে পোঁতা থাকে। পাশুক বেদির পূর্ব্ব দিকে যূপ পোঁতা হয়। আটকোণা যূপের মাথায় একটা মুকুট থাকে; তাহার নাম চষাল। যূপের পায়ে ঘি মাখাইতে হয় এই কর্ম্মের নাম যূপাঞ্জন। তার পর দড়ি জড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম রশনা। ঐ রশনার ভিতর একখণ্ড কাঠ পরাইতে হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম স্বরু। প্রত্যেক কর্ম্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্ম্মের অনুকূলে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করেন। এইরূপে যূপ পশুবন্ধনযোগ্য হয়।

বন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে দুই গাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহার নাম উপাকরণ। পশুর দুই শিঙের মাঝে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি যূপের রশনায় বাঁধিতে হয়। এইরূপ পশুবন্ধনের নাম পশু-নিয়োজন। পশুর কপালে ঘি মাখান হয়।

নিয়োজনের পর যাগের অয়োজন। যাগের আরম্ভ অনেকটা ইষ্টি যাগের আরম্ভেরই মত। উত্তর বেদির নাভিতে যে নূতন আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে, সামিধেনী মন্ত্রের সহিত তাহাতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া আগুন জ্বালান হয়। পরে সেই আগুনে আঘার হোম করিয়া দেবহোতা অগ্নির বরণ এবং তৎপরে মানুষ হোতার বরণ ইষ্টিযাগেরই মত। বরণ পাইয়া দেবতারা যজ্ঞস্থলে আসেন। এখন প্রধান যাগের

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রযাজ যাগ। ইষ্টিযাগে পাঁচটি মাত্র প্রযাজ; পশুযাগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। এই এগার যাগের দেবতাও এগার জন। ইষ্টি যাগের পাঁচ জন ত আছেনই; তাহার অতিরিক্ত আরো ছয় জন দেবতা পশু যাগে প্রযাজ আহুতি পাইয়া থাকেন। এই এগার জন দেবতার নাম যথাক্রমে (১) সমিৎ, (২) তনূনপাৎ, অথবা নরাশংস (৩) ইড়ঃ, (৪) বর্হিঃ, (৫) দুরঃ, (৬) উষাসানক্তৌ, (৭) দৈব্যৌ হোতারৌ, (৮) ত্রিস্রঃ দেব্যঃ, (ইড়া, সরস্বতী এবং ভারতী, এই তিন দেবী। ইঁহারা তিনে এক এবং একেই তিন; এই তিন দেবতার কথা আপনারা মনে রাখিবেন; ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে) (৯) ত্বষ্টা, (১০) বনস্পতি, (১১) স্বাহাকার। প্রত্যেক প্রযাজ যাগের পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণের আদেশ পাইয়া হোতা যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। পশুযজ্ঞে প্রজাজ যাগের যাজ্যা মন্ত্রের একটু বিশিষ্টতা আছে। এই যাজ্যা মন্ত্রের নাম আপ্রী মন্ত্র। দেবতাকে প্রীত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া মন্ত্রের নাম আপ্রী মন্ত্র। ঋগ্বেদ সংহিতা মধ্যে অনেকগুলি আপ্রী সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে ঐ এগার দেবতার উদ্দেশে এগারটি আপ্রী মন্ত্র পাওয়া যায়। এক একটি সূক্ত এক এক ঋষির প্রচারিত। কোনও সূক্ত বশিষ্ঠের, কোনটি বিশ্বামিত্রের, কোনটি জমদগ্নির ইত্যাদি। যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, সেই ঋষির মন্ত্র তাঁহার আপ্রী মন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যজমানের পক্ষে প্রযাজ যাগে যাজ্যা মন্ত্র বা আপ্রী মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এগার প্রযাজের মধ্যে প্রথম দশটিতে আহুতির দ্রব্য আজ্য। শেষে প্রযাজে আজ্যাহুতি হয় না। সেখানে পশুর বপা আহুতি দিতে হয়। পেটের উপরে নাভির পাশে মেদের নাম বপা। এই বপার দ্বারা অন্তিম প্রযাজের দেবতা স্বাহাকৃতির উদ্দেশে যাগ হয়। কাজেই প্রথম দশ প্রযাজ সম্পন্ন করিয়া শেষ প্রযাজের পূর্ব্বেই পশুবধের আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশু বধ করে, তাহার নাম শমিতা। পাশুক বেদির উত্তরে চাত্বালের কাছে পশুবধের স্থান। সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানে পশুর অঙ্গপাকের জন্য আগুন জ্বালিতে হয়। সেই অগ্নির নাম শামিত্র অগ্নি। একজন ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ, ইহাঁকে ইষ্টি যাগেও পাওয়া গিয়াছে। ইনি উল্মুক অর্থাৎ আগুনের উল্কা জ্বালিয়া পশুর চারিদিকে ঘূরাইয়া দেন। উদ্দেশ্য এই যে, রাক্ষসেরা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিব না। রাক্ষসেরা আগুনকে ভয় করে। এই অগ্নি-ভ্রামণ কর্ম্মের নাম পর্য্যগ্নিকরণ। এই সময়ে হোতা পশুবধের জন্য শমিতাকে নিযুক্ত করেন। যে মন্ত্রদ্বারা নিয়োগ করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিবেন। মন্ত্র মধ্যে দুই একটা কথা আপনাদের কৌতুক জন্মাইতে পারে। মন্ত্র মধ্যে বলা হয়,—এই পশুর বধকর্ম্মে ইহার মাতা অনুমতি দিক, পিতা অনুমতি দিক, সহোদর ভ্রাতা অনুমতি দিক, ইহার সখা এবং দলস্থিত অন্যান্য পশুও অনুমতি দিক। আবার বলা হয়,—ইহার পা উত্তর দিক্ আশ্রয় করুক; চক্ষু সূর্য্যকে আশ্রয় করুক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিক্‌সকলকে, এবং শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক; শেষে বলা হয়,—অহে বধকর্ত্তা, এই পশুকে হনন কর—হনন কর—হনন কর; অপাপ—অপাপ—অপাপ। এই কর্ম্মে যে সুকৃত হইল, তাহা আমাদের উপরে অর্পিত হউক। যে দুষ্কৃত হইল, তাহা অন্যের উপর অর্পিত হউক। মন্ত্র পাঠের পর অগ্নীৎ উল্মুক হস্তে আগে আগে চলেন। শমিতা দড়ি ধরিয়া পশুকে লইয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতিপ্রস্থাতা, অধ্বর্য্যু এবং যজমান চলেন। শামিত্র দেশে অর্থাৎ বধস্থানে উপস্থিত হইয়া অধ্বর্য্যু ভূমিতে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দেন এবং যজমান এবং ঋত্বিক্ সকলে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন, যেন হত্যা কর্ম্মটা দেখিতে না হয়। বধের রীতিটা

বলিতে না হইলেই ভাল হইত। শ্বাস রোধ করিয়া বধ করা হয়। এইরূপ বধের নাম সংজ্ঞপন। বধের পর যজমান, যজমানের পত্নী এবং অধ্বর্য্যু জল ঢালিয়া পশুকে ধুইয়া দেন। অধ্বর্যু পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দুই খানা কাঠে সেই বপা লইয়া শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন; পরে উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নির উপরে ধরিয়া থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিয়া বিন্দু বিন্দু আগুনে পড়িতে থাকে। অধ্বর্য্যু সঙ্গে সঙ্গে বপার উপর ঘি ঢালেন। সেই বপার কিয়দংশ যথাবিধি আপ্রী মন্ত্র পাঠের পর আগুনে ফেলিয়া অন্তিম প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। বপার অবশিষ্ট প্রধান যাগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

আমি নিরূঢ় পশুবন্ধ নামক অবশ্যকর্ত্তব্য পশুযাগের কথা বলিতেছি। এই যাগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। প্রযাজ যাগের পর অধ্বর্য্যু তাঁহাদের উদ্দেশে প্রথমে বপাহুতি দেন। বপাহুতির পর পুরোডাশ আহুতি এবং পশুর অঙ্গ আহুতি। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সেখানে পুরোডাশই প্রধান আহুতি। পশুযাগের আহুতির দ্রব্য পশুর বপা এবং পশুর মাংস। কিন্তু পশুমাংসের সহিত পুরোডাশের আহুতি না দিলে পশুযাগও সম্পন্ন হয় না। ইষ্টি যাগে অধ্বর্য্যু যেমন পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এখানেও সেইরূপ তাঁহাকে পুরোডাশ প্রস্তুত রাখিতে হয়। বপাহুতির পর এক দিকে শামিত্রাগ্নিতে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক হইতে থাকে। অন্য দিকে অধ্বর্য্যু পুরোডাশ যাগ করিতে থাকেন।

পশুর সকল অঙ্গ মেধ্য অর্থাৎ আহুতিযোগ্য নহে। হৃদয়, জিহ্বা প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার আহুতি যোগ্য। পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য। উহা উৎকরে অর্থাৎ যজ্ঞশালার বাহিরে আবর্জ্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যিনি পশুবধকর্ত্তা শমিতা, তিনিই ছুরি দিয়া

পশুর অঙ্গগুলি কাটিয়া লন, এবং তিনিই পশুমাংস হাঁড়িতে চাপাইয়া জলে সিদ্ধ করেন।

পুরোডাশ আহুতি শেষ হইলে শমিতা খবর দেন, পশুর অঙ্গ পাক হইয়াছে। অধ্বর্য্যু আসিয়া প্রধান দেবতা ইন্দ্রের ও অগ্নির উদ্দেশে পশুর অঙ্গ আহুতি দেন। অনুবাক্যা পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ এবং যাজ্যা পাঠ করেন হোতা স্বয়ং। পাকের হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ করিবার সময় খানিকটা চর্ব্বি ভাসিয়া উঠে। সেই চর্ব্বিতে দধি এবং ঘি মাখাইয়া বনস্পতি দেবতার উদ্দেশে এই সময়ে আহুতি দিবার প্রথা আছে।

প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। আগে বলিয়াছি, ইহা রুদ্র দেবতার প্রাপ্য। পশুর কয়েকটি অঙ্গ এজন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে।

তৎপরে হবিঃশেষ-ভক্ষণ। ঋত্বিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করেন, এবং যজমান এবং ছয়জন ঋত্বিক্ একযোগে ইড়া ভক্ষণ করেন। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ইড়া-ভক্ষণের একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে; সে তাৎপর্য্যের কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে; নতুবা যজ্ঞের তাৎপর্য্যই বুঝান হইবে না।

প্রধান যাগ সমাপ্ত হইল। তৎপরে অনুযাজ। ইষ্টিযাগে অনুযাজের সংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশুযাগে অনুযাজের সংখ্যা এগারটি। প্রযাজ যেমন এগারটি, অনুযাজও তেমনি এগারটি। প্রযাজের দেবতাদের অধিকাংশই অনুযাজেরও দেবতা। দধিমিশ্রিত আজ্য দ্বারা এই এগারটি আহুতি দেওয়া হয়। অধ্বর্য্যু আহুতি দেন, আর তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা অন্যত্র আগুন জ্বালিয়া পশুমাংস দ্বারা উপযাজ হোম করেন। এই উপযাজ হোম পশুযাগেই আছে, ইষ্টি যাগে নাই। ইহা যাগ নহে, হোমমাত্র। যাগের ও হোমের পার্থক্য আগে বলিয়াছি। যূপের গায়ে স্বরু নামে যে কাষ্ঠ খণ্ড বাঁধা ছিল, তাহা এই সময়ে আগুনে দেওয়া হয়।

ইহার পর পত্নী-সংযাজ। যজমানের পত্নীর পক্ষে ইহা গার্হপত্য অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আহুতির দ্রব্য পশুর লাঙ্গুল। ইহাতেই যাগ সমাপ্ত হইল। সূক্ত-বাক, শংযুবাক প্রভৃতির পাঠ হইতে যজমানের বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ এবং ব্রতবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাগ-সমাপ্তিসূচক কর্ম্ম ইষ্টিযাগের মতই। পুনরুল্লেখ আবশ্যক নহে।

যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞকে ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ এই তিন প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সোম যাগের কথা আগামী বারে বলিব। ইষ্টি যাগ ও পশু যাগের দুইটি নমুনা দিলাম। ইহাতেই নিশ্চয় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। ইষ্টিযাগের ও পশুযাগের যে নমুনা দিলাম, তাহা শুনিয়া শ্রৌতকর্ম্মের উপর আপনাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদের শ্রদ্ধা হউক আর না হউক, এক কালে বেদপন্থী সমাজে এই সকল কর্ম্ম পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আপনারা উপহাস করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ irrational; মানুষের প্রজ্ঞা, মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধি, কিছুতেই এ সকলের সমর্থন করিতে পারে না। তাহা হইতে পারে। ইংরেজিতে যাহাকে রিলিজন বলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে Reasonএর এলাকার বাহিরে। সভ্য অসভ্য সকল সমাজের লোকেই এইরূপ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাখে; প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। অতএব যিনি মানবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই অংশের আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলে চলিবে না। ইহাকে মানবের দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহাকে পাশবিকতা বলিতে পারিবেন না। কেন না, পশুর মধ্যে এই সকল অনুষ্ঠান নাই। পশুর পক্ষে এ দুর্ব্বলতা নাই। কোনও পশু কোনও রিলিজনের ধার ধারে না। ইহা মানবিকতা বটে, ইহা কখনই পাশবিকতা নহে।

দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মতের আজ কাল খুব প্রাদুর্ভাব। উহাকে

Animism বলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই Animism হইতে যাবতীয় রিলিজনের উৎপত্তি। অসভ্য লোকে সমস্ত পৃথিবীকে দেবতাময় দেখে। সকল দ্রব্যেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা সূক্ষ্ম শরীরধারী হইলেও মানুষের মতই রাগদ্বেষাদির অধীন। তাঁহাদের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক অধিক। অনেক জাগতিক ঘটনা তাঁহারাই পরিচালনা করেন। মানুষের শুভাশুভ অনেক স্থলে ইঁহাদের হাতে। বৈজ্ঞানিকেরা জগৎ ব্যাপারকে যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চাহেন। যন্ত্রের ভিতরে খেয়াল নাই। উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। অবৈজ্ঞানিক অসভ্য মানুষ সে সকল নিয়মের অস্তিত্ব জানে না; সে সর্ব্বত্রই দেবতার খেয়াল দেখে। ইহাই Animism. বিজ্ঞানবিদ্যার উন্নতির সহিত মানুষে animism হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়। ক্রমশঃ হয়, একবারে হয় না। আপনারা জানেন, সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ বাঁধা নিয়মে চলিতেছে। নিউটনের পূর্ব্বে কেপ্‌লার এই নিয়ম গুলির আবিস্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেপলারের স্থান খুব উচ্চে। এমন কি পূর্ব্বে কেপলার না জন্মিলে নিউটন তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এ হেন কেপলারও animismএর উপদ্রব এড়াইতে পারেন নাই। গ্রহগুলি কেন এইরূপ বাঁধা পথে ঘুরিতেছে, ইহা বুঝিতে গিয়া কেপলার বলিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেক গ্রহের এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী আছেন, তাঁহারাই চক্রান্ত করিয়া আপনাদের বাহন গ্রহগুলিকে ঐরূপে ঘুরাইতেছেন। ইহাই animism. এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কার কতটুকু শক্তি তাহা জানা নাই। অগত্যা সকলকেই খুসী রাখিতে হয়। দেবতাকে খুসি রাখিবার চেষ্টা হইতে রিলিজনের উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা হইতেই পূজা অর্চ্চনা, যাগ যজ্ঞের উৎপত্তি। ইহার মূলে মানুষের স্বার্থান্বেষণ। ক্রমশঃ সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করা

হয়। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলেও পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করা হয় না, কিন্তু তাহাতে নূতন উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়। ই, বি, টাইলার এক জন প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ। তিনি Animism theoryর এক জন প্রধান প্রচারক। তিনি সভ্য অসভ্য নানা সমাজের অনুষ্ঠানের সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে কোনরূপ ethical element থাকে না বলিলেই হয়। যদি থাকে তাহা scanty এবং rudimentary. উন্নত সমাজে আসিয়া তাহাই কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের vital point হইয়া দাঁড়ায়। টাইলার এক স্থলে যাগ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it. অনুষ্ঠান যাহাই হউক, এই intentionটাই বড় কথা। যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করা হয়, ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা। টাইলার সাহেব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে তিনটা স্তর সম্বন্ধে তিনটা theory খাড়া করিয়াছেন। প্রথম হইল gift theory, তার পরে homage theory, এবং সকলের উপরে abnegation theory. এক একটা থিয়োরি বুঝিবার চেষ্টা করুন। Gift theory মতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বার্থমূলক। দেবতা যাহা পাইলে খুসী হইবেন, দেবতাকে তাহাই দাও। পাদ্য অর্ঘ্য, ধূপ দীপ, বস্ত্র অলঙ্কার, মানুষ যাহাতে খুসী হয়, দেবতাও তাহাতে খুসী হইবেন। টাইলার সমস্ত পৃথিবী হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেবতাকে যে যাহা দিতে পারে, দিয়া খুসী রাখে। বিশেষতঃ উদরপূরণের ব্যবস্থাটা ভাল করিলে সকলেই খুসী হয়। নইলে এ দেশের বড় লোকেরা সাহেবদিগকে খানা দিতে এত ব্যস্ত কেন? দেবতাদের ভাল করিয়া খানার ব্যবস্থা করিতে হয়। পশু-

মাংস অনেক দেবতাই ভালবাসেন। কোন্ দেবতা কোন্ পশু ভালবাসেন, প্রত্যেক যজ্ঞে তাহার নির্দ্দেশ আছে। যাজ্যা মন্ত্রে দেবতাকে ডাকিয়া যখন বলা হয়, অগ্নে বীহি বৌষট্—তাহার অর্থই যে অগ্নি তুমি খাও এবং দেবতার নিকট খাদ্য বহিয়া লইয়া যাও। বৌষট্ শব্দটা মূলে বহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাই হইল টাইলরের gift theory. তাহার পরে homage theory, এখানে দেবতার লাভের জন্য দেবতাকে উপহার দেওয়া হয় না; যে উপহার দেওয়া যায়, দেবতা তাহা না লইতেও পারেন; কিন্তু আমি যে দেবতাকে দিতে প্রস্তুত আছি, ইহাই জানাইয়া আপনার অধীনতার বা বশ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহারই নাম homage. এ দেশে রাজাকে, জমিদারকে নজর দেওয়া রীতি আছে; রাজা নজরের টাকা গ্রহণ করেন, অথবা স্পর্শ মাত্রই ফিরাইয়া দেন; প্রজা তাহাতেই কৃতার্থ হয়। দেবতাও সেইরূপ গ্রহণ করুন, আর না করুন, কোনও দ্রব্য উপহার দিয়া বা উপহারের অভিনয় করিয়া দেবতার বশ্যতা স্বীকার করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটু ধর্ম্মভাব, একটু ethical element আছে। জেহোবার মন্দিরে য়িহুদিরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দিত। মন্দিরের উঠান গরু এবং ভেড়ার পালে পরিপূর্ণ থাকিত। উচ্চ বেদির উপর সর্ব্বদা আগুন জ্বলিত। বেদির নীচে নর্দ্দমায় রক্তের স্রোত বহিত। আড়ম্বরের অন্ত ছিল না, অথচ য়িহুদিরা তাহাদের জেহোবাকে খুব বড় দেবতা মনে করিত। তিনি যে কেবল উদরপূরণের জন্য এত উপহার লইতেছেন, এরূপ মনে করা বোধ হয় তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহাদের একটা প্রধান পূজার নাম sin-offering. য়িহুদী সর্ব্বদাই আপনাকে পাপী মনে করিত। তাহাদের যত কিছু দুঃখতাপ তাহা সেই পাপেরই ফল মনে করিত। এই sin-offeringএর দ্বারা জেহোবার নিকট সেই পাপ স্বীকার করিয়া পাপক্ষালনের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিত মাত্র। ইহা দেবতাকে ঘুষ দেওয়া নহে; দেবতার নিকট দৈন্যস্বীকার

বা বশ্যতাস্বীকার মাত্র। ইহারও উপরে abnegation theory. Abnegation শব্দের অর্থ স্বার্থত্যাগ। এখানে উদ্দেশ্য স্বার্থলাভ নহে; উদ্দেশ্য বরং তাহার বিপরীত। ইহার ভিতরে মানুষের ধর্ম্ম-ভাবটা আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবতার লাভ হউক বা না হউক, দেবতা ফল দেন বা না দেন, আমাকে কিছু ত্যাগ করিতেই হইবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই; কর্ম্মফলে দৃষ্টি রাখিবার আমার দরকার নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবতার উদরপূরণের চেষ্টা থাকে না; তবে এমন কোনও দ্রব্য দিতে হয়. যাহাতে আমার স্বার্থ-ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়; যাহার ত্যাগে বস্তুতই আমার সমূহ ক্ষতি আছে। নরবলির কথা অপনারা জানেন। এখনও বহু সমাজে নরবলি চলিত আছে; এক কালে হয় ত সকল সমাজেই ছিল। যাহারা নরমাংস উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা দেবতাকে সেই উপাদেয় মাংস ভোজনের জন্য দিবে, তাহাতে বিস্ময় কি! কিন্তু যাহারা নরমাংস ভোজন করে না, তাহাদের মধ্যেও নরবলির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। য়িহুদী, গ্রীক, রোমান সকলেই এককালে মরবলি দিত, তাহা আপনারা জানেন। আইফিজিনিয়ার গল্প, জেফথার দুহিতার গল্প, আপনারা জানেন। ফিনিক প্রভৃতি সেমিটিক জাতিরা সুসভ্য জাতি ছিল; অথচ তাহাদের মধ্যে এই ভীষণ প্রথা বহুল ভাবে চলিত ছিল। দেবতাকে দিবার জন্য বড় ঘরের ছেলে পছন্দ করা হইত। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পছন্দ করা হইত। পিতার একমাত্র পুত্রকে পছন্দ করা হইত। রোম সাম্রাজ্যের যখন খুব পরাক্রম, তখন সম্রাট এলাগাবেলাস নূতন করিয়া নরবলির প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় ঘরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া বলি দেওয়া হইত। ব্যাপারটা ভীষণ এবং লোমহর্ষকর। কিন্তু ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ ধর্ম্মভাবও আছে। দেবতা নরমাংস খাইতে ভালবাসেন, এরূপ তাৎপর্য্য নয়; তাৎপর্য্য ত্যাগস্বীকার; যাহা সব চেয়ে মূল্যবান, যাহা সব চেয়ে প্রিয়, তাহাকেই

উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই ত ত্যাগস্বীকার হয়। আপনারা শুনঃ-শেপের বৈদিক আখ্যায়িকা শুনিয়া থাকিবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা আছে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নী স্বত্বেও পুত্র হয় নাই। তিনি বরুণের নিকট মানসিক করিলেন, আমাকে পুত্র দাও; সেই পুত্রই তোমাকে দিব। বরুণের বরে পুত্র জন্মিল। রাজা কিন্তু পুত্র দিতে পারিলেন না, নানা ওজর বাহির করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বয়স্ হইলে পুত্র বনে পলাইল। দেবতার ক্রোধে রাজার উদরী রোগ হইল। পুত্র রোহিত বনের মধ্যে অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাহার তিন পুত্র ছিল। রোহিত মনে করিলেন, অজীগর্ত্তের একটি পুত্রকে খরিদ করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিই। আমার বদলে তাহাকে দিলেই বরুণ খুসী হইবেন। ইহাকেই বলে নিষ্ক্রয়। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে তাহার বাপ ছাড়িয়া দিল না; কনিষ্ঠকে মা ছাড়িল না। অবশেষে মধ্যম শুনঃশেপকে রোহিত খরিদ করিয়া লইলেন। রাজা শুনঃশেপকে পশুরূপে পাইয়া যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞের পর্য্যগ্নিকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, কিন্তু শুনঃশেপকে বধ করিবার লোক পাওয়া যায় না। নরপশু-বধে কেহ রাজি হয় না। পিতা অজীগর্ত্ত উপস্থিত ছিল। সে মূল্য পাইয়া পুত্রকে বেচিয়াছিল; আর কিছু মূল্য পাইয়া খড়্গাহস্তে পুত্রবধে উপস্থিত হইল। পুত্র তখন অগত্যা দেবতা-দিগকে ডাকিতে লাগিলেন। নানা দেবতার উদ্দেশে তাঁহার মুখ দিয়া ঋক্ মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। এই ঋক্ মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে পাওয়া যায়। দেবতারা খুসী হইলেন; শুনঃশেপের বন্ধন খুলিয়া গেল। অজীগর্ত্ত তখন বলিলেন, বাবা শুনঃশেপ, আমার কাছে ফিরে এস। ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে একজন ছিলেন স্বয়ং বিশ্বামিত্র। তিনি শুনঃশেপকে কোলে লইয়া বলিলেন, শুনঃশেপ, তুমি এই পিশাচ

বাপটার কাছে যাইও না, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। আমার পুত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ হইবে। শুনঃশেপের মুখ দিয়া ইতি-পূর্ব্বেই ঋক্ মন্ত্র বাহির হইয়াছিল; তদবধি তিনি ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে তিনি জহ্নু বংশের আধিপত্য এবং গাথি বংশের দৈব কর্ম্মের অধিকারী হইয়া উভয় বংশের গৌরব বাড়াইলেন।

বেদপন্থী সমাজের যে যুগের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল কি না, এ প্রশ্ন উঠে; শুনঃশেপের উপাখ্যান পড়িয়া প্রথমেই সন্দেহ জন্মে, তখন নরযজ্ঞ হয় ত প্রচলিত ছিল। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদপন্থী সমাজের কোন দোষ বা ত্রুটী পাইলে তাহা ঢাকিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারাও প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সে সময়ে নরযজ্ঞ চলিত ছিল না। শুনঃশেপের গল্প, গল্প মাত্র। উহা ইতিহাস নহে। পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যে বলেন, শুনঃশেপের উপাখ্যানটি পরবর্ত্তীকালের কাল্পনিক উপাখ্যান। নরযজ্ঞ চলিত থাকিলে শুনঃশেপের বধের জন্য লোকের অভাব হইত না। বিশ্বামিত্র, যিনি যজ্ঞের ঋত্বিক্ ছিলেন, তিনি ত শুনঃশেপের বাপের উপর চটিয়াই আগুন হইয়াছিলেন; যজ্ঞ পণ্ড হওয়ায় তিনি খুসীই হইয়াছিলেন। শুনঃশেপও পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি আমার বাপ নহ; তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, শূদ্রেও তাহা পারে না। অতএব এই উপাখ্যান হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে, নরযজ্ঞ সে সময়ে প্রচলিত ছিল। বেদে পুরুষমেধের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও নরযজ্ঞ নহে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহা symbolical sacrifice. প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ ছিল না, সে বিষয়ে মতভেদ নাই বলিলেই হয়।

সে সব কথা এখন থাক্। শুনঃশেপের উপাখ্যানে আপনারা

দেখিলেন, রাজপুত্র রোহিত আপনার বদলে শুনঃশেপকে অর্পণ করিয়া দেবতাকে তৃপ্ত করিতে চাহিতেছেন। এইরূপ একের বদলে অন্যকে প্রদান, একের প্রতিনিধিরূপে অন্যকে প্রদান—ইহার নাম নিষ্ক্রয়—vicarious offering. যজ্ঞানুষ্ঠানে এই নিষ্ক্রয়ের প্রথা বহু দেশে প্রচলিত আছে। টাইলর সাহেবই নানা দেশ হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই নিষ্ক্রয়ের থিয়োরির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতি বাবা আদমের পাপে পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য sacrifice দরকার। য়িহুদীদের মধ্যে পাপ-ক্ষালনার্থ পশুবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। জেহোবার মন্দিরে সহস্রে সহস্রে পশু বলি হইত। খ্রীষ্ট আসিয়া বলিলেন, পশু বলির আর প্রয়োজন নাই। মানুষ আপনাকে বলি না দিলে বিধাতার ক্রোধ যাইবে না; নরবলি আবশ্যক। কিন্তু বিধাতা করুণাময়; তিনি দেখিলেন, আমি নিজে দয়া না করিলে মানুষের পরিত্রাণ নাই। অতএব তিনি পুত্রকে মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইলেন। এই পুত্রই খ্রীষ্ট; পিতাপুত্রে কোনও ভেদ নাই; পিতাপুত্রে উভয়েই একাত্মা। ঈশ্বর এক বই দুই নহেন। কিন্তু পিতাও যেমন ঈশ্বর, পুত্রও ঠিক্ তেমনি ঈশ্বর। এ এক রকম অচিন্ত্য ভেদাভেদের ব্যাপার। ভেদ সত্ত্বেও ভেদ নাই, এ হেঁয়ালি মানুষের অধিগম্য নহে। যাহাই হউক, খ্রীষ্ট মানব দেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাধারে ষোল আনা ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ; পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। পরিপূর্ণ মানুষ বলিয়াই তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধি। তিনি আপনাকে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যজ্ঞিয় পশুরূপে অর্পণ করিলেন। তাঁহার রক্তে মানবজাতির পাপ একেবারে ধুইয়া গেল। ইহা নিষ্ক্রয়ের ব্যাপার। মানুষ আপনাকে অর্পণ করিতে পারিল না; ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হইয়া নিষ্ক্রয়স্বরূপ মানব-জাতির প্রতিভূরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন; ক্রুসে চড়িয়া প্রাণ দিলেন। ইহা হইল vicarious sacrifice. ইহা এক মহাযজ্ঞ। এই একমাত্র

যজ্ঞে মানুষের পাপ মোচন হইয়া গেল। আর কোনও যজ্ঞের আবশ্যকতা থাকিল না; জেহোবার মন্দিরে আর পশুবলিরও আবশ্যকতা থাকিল না।

বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল না; তবে নরযজ্ঞের স্মৃতি বোধ করি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। একের বদলে অন্যকে নিষ্ক্রয়স্বরূপে অর্পণ করা যাইতে পারে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, পুরাকালে দেবগণ মানুষ্যকে পশুরূপে আলম্ভন অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই মনুষ্য হইতে যজ্ঞ-ভাগ পলায়ন করিল এবং অশ্বে প্রবেশ করিল। অশ্ব তখন মেধ্য হইল। মেধ্য শব্দের অর্থ যজ্ঞযোগ্য, দেবতাকে অর্পণযোগ্য। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সেই মনুষ্যকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সেই মনুষ্য তখন কিম্পুরুষ হইল। দেবতারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল, এবং গরুতে প্রবেশ করিল; তদবধি গরু মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; অশ্ব তখন গৌর মৃগ হইল। দেবতারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিয়া মেষে প্রবেশ করিল; তদবধি মেষ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সে গরু গবয় হইল। দেবতারা মেষের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই মেষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং ছাগে প্রবেশ করিল। সেই ছাগ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত মেষকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন; সেই মেষ উষ্ট্র হইল। যজ্ঞভাগ সেই ছাগে বহুকাল ধরিয়া অবস্থিত ছিল। সেইজন্য পশুমধ্যে ছাগ, পশুযজ্ঞার্থ শ্রেষ্ঠ। দেবতারা ছাগের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই ছাগ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তদবধি পৃথিবীই মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সকল পশু অমেধ্য

অর্থাৎ যজ্ঞের অনুপযুক্ত। ইহাদের মাংস ভোজন করিবে না। দেবতারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট যজ্ঞভাগের অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন সেই যজ্ঞভাগ ব্রীহি ধান্য হইল। সেই জন্য ব্রীহি ধান্য হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ দান করা হয়। ইহাতে পশুদানেরই ফল পাওয়া যায়। শত-পথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই আখ্যায়িকা প্রায় এই আকারেই আছে।

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইষ্টি যাগে, এমন কি পশুযাগে এবং সোমযাগেও পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞেই পুরোডাশ আহুতির প্রথা চলিত হইয়াছিল। পশুমাংসের আহুতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছিল। পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পশুমাংস একেবারেই আবশ্যক হইত না। পশুযাগে বা সোমযাগে পুরোডাশও ছিল; পশুও একবারে বর্জ্জিত হয় নাই। কিন্তু পশুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কয়টি পশু দিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বাঁধা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক দিবার উপায় ছিল না। নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগ, যাহা, অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও বৎসরের মধ্যে একবারের, জোর দুইবারের, অধিক করিতে হইত না, তাহাতেও একটির অধিক পশুর দরকার হইত না। দেবতার প্রীতির জন্য কাম্য কর্ম্মে যাহারা পশু বলি দেয়, তাহারা ইচ্ছামত সংখ্যা বাড়াইতে পারে। এ কালের দেবী-পূজায় গরিব লোকে একটা বলি দেয়; সম্পন্ন লোকে বহু বলি দেয়। বৈদিক যজ্ঞে কিন্তু ইচ্ছামত পশুর সংখ্যা বাড়াইবার উপায় ছিল না। বড় বড় ধনী লোকের কাম্য যজ্ঞে—অশ্বমেধাদি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞে—বহু পশু আবশ্যক হইতে পারিত; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের নিত্য যজ্ঞে বহু পশুর দরকার হইত না। বৈদিক যজ্ঞের পশুহত্যায় একটা মহামারী হইত, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ হেতু নাই। সে সময়ে পশুবধে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল, ইহা মনে করাই সঙ্গত। প্রাচীন প্রথা একেবারে ত্যাগ করা যায় না—

বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে। তখন পশুবধ যাহা হইত, তাহা আরও প্রাচীন-কালের survival মনে করা যাইতে পারে। পশুর বদলে রুটি দেওয়ার তাৎপর্য্যই এই। ব্রহ্মবাদীরা বলিতেছেন পশুমাংসের বদলে কৃষিজাত যব বা চাউল দিলেই পশু দেওয়ার ফল হইবে। ইহাই নিষ্ক্রয়; পশুর পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয় পুরোডাশ। আমি যে উপাখ্যান শুনাইলাম, তাহাতে ব্রহ্মবাদী স্পষ্ট বলিতেছেন, হয় ত এককালে যজ্ঞে নরমাংস দেওয়াই প্রথা ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নরপশুর বদলে ক্রমশঃ ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, অবশেষে ধান ও যব চলিত হইয়াছে। ইহাই নিষ্ক্রয়।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে তিনটা পণ্ডিতী মতের উল্লেখ করিয়াছি; সমাজের অভিব্যক্তির তিনটা স্তরে তিনটা মত। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করিয়া দেবতার খোরাক যোগাইয়া তাঁহার প্রীতিসাধন এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য কোনও কিছু অর্পণ করিয়া দেবতার নিকট বশ্যতা স্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখার দরকার হয় না। কেজো জিনিষের বদলে অকেজো জিনিষ দিলেও বিশেষ হানি নাই; নিষ্ক্রয়স্বরূপে অল্পমূল্যের জিনিষ দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্ত্তে রুটি দিলেও চলিবে। আরো উন্নত তৃতীয় স্তরে স্বার্থ অন্বেষণের স্থানে একবারে স্বার্থত্যাগ আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অভিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। বেদপন্থীরা এই ত্যাগটাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। যাজ্ঞিকের পরিভাষা-মতে কোনও দ্রব্য ত্যাগেরই নাম যজ্ঞ। অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশে যে কোনও যাগে অধ্বর্য্যু যজমানের পক্ষ হইতে আহুতি দিতেন; যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন এবং আহুতির পর ত্যাগ-মন্ত্র পড়িতেন। ত্যাগমন্ত্র ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম, ইদং সোমায়—ন মম, ইদম্ ইন্দ্রায়—ন মম, এইরূপ আকারের। তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাকে সর্ব্বস্ব

দিতে হইবে ; যাহা কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না। তবে মানুষে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, আত্মসমর্পণ করিতে পারে না ; আপনাকে দিতে পারে না ; কাজেই নিষ্ক্রয়রূপে অন্য কিছু দিতে হয়। এই নিষ্ক্রয়-ব্যাপারের কথা বেদের অনেক স্থানে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে আছে, যে যজমান সোমযাগে দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতার নিকটেই আপনার আলম্ভনে (অর্থাৎ আত্মসমর্পণে) প্রবৃত্ত হয়। সে সকল দেবতার নিকটেই আপনার বদলে পশুকে নিষ্ক্রয় করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় শব্দটিই স্পষ্ট ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে, ঐ যাগে যে পশু দেওয়া যায়, সেই পশু যজমানেরই প্রতিনিধি।

আগেই বলিয়াছি, হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না। অগ্নিহোত্র যাগের পর যে দুগ্ধ আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার শেষাংশ খাইতে হয়। পূর্ণমাস যাগে পুরোডাশের কিয়দংশ যাগের পর খাইতে হয়। পশু-যাগেও পশুমাংস খানিকটা খাইতে হয়। সোম যাগের পূর্ব্বে অগ্নি ও সোমকে যে পশু দেওয়া হইত, তাহার মাংস খাওয়া চলিবে কি না, তাহা লইয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সংশয়ের একটা কারণ ছিল। এই পশু ত যজমানেরই প্রতিনিধি ; যজমান আপনার বদলে এই পশু দিতেছেন, তাহা হইলে পশুর মাংস ত নরমাংস ; এই নরমাংস খাওয়া উচিত হইবে কি না? কোনও কোনও ব্রহ্মবাদী এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় থিয়োরির সমর্থক হইলেও এখানে অগত্যা তাঁহাকে অন্য থিয়োরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, অগ্নির ও সোমের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়াছিলেন। তিনি বৃত্রবধের পর তুষ্ট হইয়া অগ্নি ও সোমকে বর দিয়াছিলেন যে সোমযাগের

পূর্ব্বদিন যে পশু দেওয়া হইবে, তাহা তোমরাই পাইবে; ইহাই তোমাদের পুরস্কার হইবে। এক নিশ্বাসে নিষ্ক্রয় থিয়োরিটা উল্টাইয়া গেল। ঐ পশু দেবতাদের ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্র; উহা নরের প্রতিনিধি নহে; অতএব উহার মাংস-ভক্ষণে কোন দোষ হইবে না। আসল কথা যে হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলেই নয়। কেন নয়, সে গুরুতর কথা; সে প্রসঙ্গ পরে তুলিব। এখন বলিয়া রাখি, ব্রহ্মবাদীদের এই তর্ক শুনিয়া আপনারা হাসিবেন না। সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ঠিক এইরূপ একটা মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঠিক এইরূপ তর্ক উঠায় খ্রীষ্টীয় সমাজ শত সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, যীশুখ্রীষ্ট একাধারে ষোল আনা ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ। দেবত্ব এবং মানবত্ব তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মত পূর্ণমনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানবই যাবতীয় মানবের নিষ্ক্রয় বা প্রতিনিধি হইতে পারে। যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে না। যজ্ঞে মানুষের আত্ম-সমর্পণ আবশ্যক। তাই যীশু সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্রুসে চড়িয়া মৃত্যুই তাঁহার আত্মসমর্পণ। ক্রুসে চড়িবার পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি আপনার অনুগত শিষ্যদিগকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছিলেন; ভোজনের জন্য রুটি আর মদ ছিল; শিষ্যদের প্রত্যেককে একটু করিয়া মদ দিলেন, এবং সেই রুটি ভাঙ্গিয়া প্রত্যেককে বিতরণ করিলেন; বলিলেন, এই যে রুটি দিলাম, ইহা আমার মাংস; আর এই যে মদ, ইহা আমার রক্ত। ইহা খাইলেই আমার মাংস এবং আমার রক্ত ভোজন করা হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যজ্ঞিয় পশুরূপে আপনাকে বলি দিলাম; যজমানের পক্ষে হবিঃশেষ ভক্ষণ আবশ্যক—আমার রক্ত মাংস ভক্ষণ আবশ্যক। আমার তিরোভাবের পর তোমরা এইরূপে রুটি এবং মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিও। ইহাতেই তোমাদের দৈনন্দিন যজ্ঞ সাধন হইবে। জেহোবার মন্দিরে আর পশু

বলির প্রয়োজন হইবে না। তদবধি পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা রুটি ও মদ উৎসর্গ করিয়া তাহা ভক্ষণ করেন। যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উৎসর্গের দ্বারা ঐ রুটি খ্রীষ্টের মাংসে এবং মদ খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়। উহা খাইলে খ্রীষ্টেরই রক্ত এবং মাংস খাওয়া হয়। খ্রীষ্টসম্পাদিত মহা যজ্ঞের অনুকরণে তাঁহার আশ্রিতেরা এই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ইহার নামই হইল eucharistic sacrifice. ইহা বস্তুতই হবিঃশেষ ভক্ষণের ব্যাপার। ইহা দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়। এই জন্য এই অনুষ্ঠানের নাম Holy Communion। এ দেশের ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে যেমন তর্ক উঠিয়াছিল, অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশুর মাংস নরমাংস কি না, সেইরূপ খ্রীষ্টানদের মধ্যেও তর্ক উঠিয়াছিল, বস্তুতই রুটি ও মদ খ্রীষ্টের মাংস ও রক্তে পরিণত হয় কি না? বস্তুতই উহা রক্ত মাংসে পরিণত হয়, তাহা কোনও কেমিষ্ট বলিতে পারিবেন না। অথচ সমস্ত খ্রীষ্টান এক সময়ে একযোগে বলিতেন যে উৎসর্গের পর রুটি রুটি থাকে না, মদ মদ থাকে না; সত্য সত্যই রক্ত মাংসে পরিণত হয়। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, উৎসৃষ্ট রুটি হইতে রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। মদের ও রুটির এইরূপ রক্ত মাংসে পরিণতির নাম transubstantiation. রোমান এবং গ্রীক চার্চের সকল লোকেই অর্থাৎ বার আনা খ্রীষ্টান এই বিংশ শতাব্দীতেও এই অলৌকিক পরিণতি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। গুরু-কল্প ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এখনই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন, যে রুটির মধ্যে কেবলই starch আছে; উৎসর্গ দ্বারা উহা proteidএ পরিণত হয় নাই। তাঁহার শিষ্যস্থানীয় আমাকেও সেই কথায় সায় দিতে হইবে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে, ঐ রুটি আর রুটি থাকে না; মদ, মদ থাকে না। এই বিশ্বাসে আঘাত করিলে তাহাদের জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

আর বাহুল্যে কাজ নাই। এ বিষয়ে আবার আমাকে আসিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এবং বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য যে একই রকম, তাহা দেখাইবার জন্যই এ প্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছি। খ্রীষ্টানের দেবতা য়িহুদীর দেবতারই রূপান্তর। য়িহুদীর দেবতা রক্ত মাংস দুই চাহিতেন; তাই খ্রীষ্ট রক্ত মাংস দুই দিয়াছিলেন। মদ হইল রক্ত; রুটি হইল মাংস। আমাদের দেশে আধুনিক কালে মহাদেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। কিন্তু বৈদিক দেবতারা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুর রক্ত রাক্ষসেরা পাইত; দেবতারা কেবল মাংসেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। পুরোডাশ বা রুটি মাংসের স্থানীয়। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন মাংসস্থানীয়, আমাদের রুটিও তেমনি মাংসস্থানীয়। রক্তটা গেল কোথায়? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন,—এই যে পুরোডাশ-দান, এতদ্দ্বারা পশুরই আলম্ভন হয়। যে যব বা ধান হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত হয়, তাহাতে যে কিংশারু বা খড় লাগিয়া থাকে, তাহাই পশুর লোম। যে তুষ থাকে, তাহাই পশুর চর্ম্ম। যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহাই মাংস। যে ক্ষুদ ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই রক্ত। কুলায় ঝাড়িয়া তুষের এবং ক্ষুদের কণা রাখিয়া দেওয়া হইত এবং যাগশেষে উহা রাক্ষসদিগকে দেওয়া হইত, ইহা পূর্ণমাস যাগপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। এইরূপে রাক্ষসেরা তাহাদের প্রাপ্য রক্তের ভাগ পাইত।

আমাদের দেবতারা রক্ত চাহিতেন না। খ্রীষ্টানের যজ্ঞে রক্তের স্থলে মদ দিতে হয়। বৈদিক যজ্ঞে দুই একটা স্থলে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সৌত্রামণি যাগে সুরার প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ যজ্ঞে সুরা চলিত না। কিন্তু আর একটা মাদক দ্রব্য চলিত। উহা সোমলতার রস। সোম-যাগের কথা এইবার বলিতে চাহি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রস্তুত থাকুন।

---

# সোম যাগ।

সোম যজ্ঞ অতি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত জটিল। অনেক সরঞ্জাম আবশ্যক; বহু ঋত্বিক্ আবশ্যক; ব্যয় বিধানও যথেষ্ট। সকলের পক্ষে ইহা সাধ্য ছিল না। সেই জন্য ইহা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইত না। তবে ব্রাহ্মণের ঘরে পর পর তিন পুরুষের মধ্যে কেহ সোম যাগ না করিলে নিন্দা হইত। সেই ব্রাহ্মণকে দুর্ব্রাহ্মণ বলিত। সোম যজ্ঞ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বেই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরাণীদের মধ্যে সোম যজ্ঞ চলিত ছিল। সোম স্বয়ং এক জন দেবতা। দেবতাদের মধ্যে একজন রাজা। পরবর্ত্তী কালে দেবতাদের মধ্যে চারি জন রাজার কথা শুনা যায়। এক এক রাজা এক এক দিকের অধিপতি। রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের, রাজা যম দক্ষিণ দিকের, রাজা বরুণ পশ্চিম দিকের, রাজা সোম উত্তর দিকের অধিপতি। দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। পার্থিব সোম মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ। এই পার্থিব সোম এক জাতীয় পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্। হিমালয়ের উত্তরে মূজবান্ পর্ব্বতে ইহা পাওয়া যাইত। মূজবান্ পর্ব্বত কোথায় বলা যায় না। হয় ত ইহাই পরবর্ত্তী কালে কৈলাস পর্ব্বতে দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মূজবান্ পর্ব্বতে রুদ্র দেবতার বাস ছিল। বেদের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। এই রুদ্র দেবতা পরবর্ত্তী কালে আমাদের মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন। সোম সেই মহাদেবের চিহ্ন। মহাদেব ললাটে বা মস্তকে সোমকলা ধারণ করেন। এখন আমরা সোম অর্থে চন্দ্র বুঝি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সোম এবং চন্দ্রকে এক বলিয়া

গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সকলে ইহা মানিতে চান না। তাঁহারা বলেন, বৈদিক সাহিত্যের অতি প্রাচীন স্তরে সোমের সহিত চন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না; বেদের সোম গোড়ায় সোমলতা মাত্র; উদ্ভিদ্ মাত্র। সোমপান করিলে মত্ততা জন্মিত এবং লোকে স্ফূর্ত্তি ও বল পাইত; এই জন্য সোমকে দেবতা করিয়া লইয়াছিল। ইরাণীরা সোমকে হোমা বলিত। আমাদের দেশে সোম যাগ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু বোম্বাইয়ের পার্সীরা এখনও সোম যাগ করিয়া থাকেন। এখন যে উদ্ভিদের রস তাঁহারা এজন্য ব্যবহার করেন, তাহাকে হুম বলে। মার্টিন হোগ নামক পণ্ডিত মূল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইয়ে থাকিয়া পার্সীদের প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি এই হুম রস পান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ। উহাতে কোন দেবতার বা কোন মানুষের তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। ফল কথা, পুরাকালে যে সোম যজ্ঞার্থ ব্যবহৃত হইত, সে সোম কোন্ উদ্ভিদ্, তাহা কেহ এখন জানে না। বেদপন্থী সমাজে যখন সোম যাগের বহুল প্রচার ছিল, তখনও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। পর্ব্বত হইতে সোম আনিয়া যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। যজ্ঞের সময় সোম-বিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া বসিত। যজমান মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করিয়া লই-তেন। সোম ক্রমশঃ দুর্লভ হওয়াই সোম যজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ার একটা মুখ্য কারণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজে সোম যজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল। নানাবিধ সোম যাগ তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা যে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোম যাগ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কালক্রমে সোমপানের অধিকারে বঞ্চিত

হইয়াছিলেন। সোমপানে অধিকার ব্রাহ্মণেরা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যজমানেরা সোম যজ্ঞ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে সোমরসের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পান করিতে হইত। ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বা যজ্ঞডুমুরের রস পান করিতেন; বৈশ্যের পক্ষে দধির ব্যবস্থা ছিল; ইহাতেই তাঁহাদের সোমপানের ফল হইত। ক্ষত্রিয়েরা সোমপান করিতে পাইবেন কি না, তাহা লইয়া কিছু দিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক, গণ্ডগোল চলিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা সহজে অধিকার ছাড়িতে চাহেন নাই। ইহা লইয়া যজ্ঞের সময় হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। যাঁহারা এ বিষয়ে কুতূহলী, তাঁহারা আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদের পঁয়ত্রিশ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সোমপানের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একটা খুব বড় নজির দেখাইতেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন; বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন; আরও অনেক অনুচিত কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ এবং বৃত্র উভয়েই দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র এইরূপে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইলে দেবতারা বিদ্রোহী হইয়া ইন্দ্রের সোমপান বন্ধ করিয়া দেন। দেখাদেখি ক্ষত্রিয়দেরও সোমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেদপন্থী সমাজে নানাবিধ সোম যাগের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন যজ্ঞ এক দিন, কোন যজ্ঞ একাধিক দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এক দিনের যজ্ঞকে ঐকাহিক যজ্ঞ বলিত। দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন। বার বা বারর অধিক দিন লাগিলে নাম হইত সত্র। কোন কোন সত্র সংবৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত। আমি কেবল আপনাদিগকে ঐকাহিক অর্থাৎ এক দিনে সম্পাদ্য সোম যাগের বিবরণ দিব। এই শ্রেণির সোম যাগের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম অন্ততঃ সাত রকমের ছিল; অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্য্যাম এবং বাজপেয়।

ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রকৃতি, অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র। অগ্নিষ্টোমের প্রয়োগ-পদ্ধতি জানিলে অন্য গুলিরও পদ্ধতির মোটা জ্ঞান জন্মিবে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞের পদ্ধতি ঠিক পাওয়া যায় না। পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য, মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তৎসম্পর্কে উপাখ্যানাদি নানা কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রহিয়াছে। খাঁটি পদ্ধতিটুকু বুঝিবার জন্য শ্রৌতসূত্র নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র রচিত হইয়াছিল। আমি ঐতরেয় এবং শতপথ এই দুই ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন এবং কাত্যায়ন এই দুই শ্রৌতসূত্রের সাহায্য লইয়া অগ্নিষ্টোমের বিবরণ সংকলন করিয়াছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল। উহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে পরম সহিষ্ণু শ্রোতারও ধৈর্য্য থাকিবে না। সেই জন্য অনেক কাট ছাঁট করিয়া যাহাতে একটা মোটা জ্ঞান জন্মিতে পারে, এইরূপ বিবরণ উপস্থাপিত করিতে চাহি।

গৃহস্থের অগ্নিশালায় সোম যাগের স্থান সংকুলান হইত না। গ্রামের বাহিরে গিয়া যজ্ঞভূমি পছন্দ করা হইত। উহার নাম দেবযজন-ভূমি। সেখানে দুইটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হইত। একটি ঐষ্টিক বেদি, সোম যাগের আনুষঙ্গিক ইষ্টিযাগগুলির জন্য। তাহার পূর্ব্ব দিকে আর একটা বড় বেদি, ইহার নাম সৌমিক বেদি বা মহাবেদি; এই মহাবেদি অনেকটা পাশুক বেদির মত। ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে যথাস্থানে আহবনীয়াদি তিন অগ্নির এবং ব্রহ্মাদি ঋত্বিকের স্থান থাকিত; সমস্তই ইষ্টি যাগের মত। এই বেদিকে ঘেরিয়া খুঁটির উপর আচ্ছাদন দিয়া যে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইত, তাহার নাম প্রাগ্‌বংশ শালা; খুঁটির উপরের বাঁশগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে খাটান হইত, সেই জন্য নাম প্রাগ্‌বংশশালা। মহাবেদির উপরেও ঐরূপ কয়েকটি শালা বা মণ্ডপ তৈয়ার করিতে হইত।

পশ্চিমাংশের মণ্ডপটির নাম সদঃশালা; মাঝখানে হবির্দ্ধান মণ্ডপ; আর বেদির দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট মণ্ডপ, নাম আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালার ভিতরে এক সারি অগ্নি থাকিত, অগ্নিস্থানগুলির নাম ধিষ্ণ্য। ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে বসিয়া ঋত্বিকেরা সোম যাগের মন্ত্র পাঠ করিতেন। মাঝখানে একটি ডুমুরের ডালের খুঁটি পোঁতা থাকিত; নাম ঔদুম্বরী শাখা—উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা ঐ ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া সামগান করিতেন। দুই পাশের দুই কুঠরিতেও দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান থাকিত। মহাবেদির পূর্ব্বাংশে উত্তর বেদি ও তাহার নাভি পাশুক বেদির মতই; উহার পূর্ব্ব দিকে পশু বন্ধনের জন্য যূপের স্থান, এবং ভিতরে চাত্বাল, উৎকর ও শামিত্র ভূমি পশু যাগেরই অনুরূপ।

ইষ্টি যাগে চারি জন, পশু যাগে ছয় জন, কিন্তু সোম যাগে ষোল জন ঋত্বিকের দরকার হয়। সকলের নাম জানার দরকার নাই। জনকয়েকের নাম জানা আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ ত আছেনই; তাহার উপরে অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা এবং হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ইঁহারাও আছেন। হোতার আর দুই জন সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। নাম দুটি কষ্ট করিয়াও মনে রাখিবেন। ইষ্টি যাগে ও পশু যাগে সামগান নাই; সোম যাগে সামগান নহিলে চলে না। সেই জন্য উদ্গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই এগার জন ছাড়া আরো পাঁচ জনের দরকার। এইরূপে সর্ব্বসমেত ষোল জন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়। ষোল জন ঋত্বিক্ ছাড়া চমসাহুতির জন্য দশ জন চমসাধ্বর্য্যুর প্রয়োজন। ইঁহারা ঋত্বিক্ নহেন, তবে সোমযাগে সহকারিতা করেন। যাগের পূর্ব্বে সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি ষোল জন ঋত্বিক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং যজমান তাঁহাদিগকে বরণ করেন। দেবগণের যজ্ঞে অগ্নি হোতা, আদিত্য অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা এবং অপ্ সমূহ

অন্যান্য ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। যজমান প্রথমে দেব ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে মানুষ ঋত্বিকৃদের বরণ করেন। আপনাদিগকে বলিয়াছি, অগ্নিষ্টোম এক দিনের যজ্ঞ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি ইষ্টি যাগ ও অন্যান্য কর্ম্ম না করিলে সোম যজ্ঞে অধিকারই জন্মে না। ফলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এক দিনের যজ্ঞ হইলেও উদ্যোগ আয়োজন করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতে পাঁচ দিন সময় লাগে। যথাক্রমে বিবরণ দিতেছি।

প্রথম দিন।—প্রথম দিনে যজমান দীক্ষিত হন। ইষ্টি যাগে বা পশু যাগে দীক্ষার প্রয়োজন নাই। এই দীক্ষা এবং দীক্ষার অনুকূল ইষ্টি যাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। আগেই বলিয়াছি, ইষ্টি যাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি এবং সোম যাগের জন্য মহাবেদি আবশ্যক। যজমানের বাড়ীতে পূর্ণমাসাদি যাগের জন্য অগ্নিশালা থাকে। কিন্তু এখানে গ্রামের বাহিরে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন ঐষ্টিক বেদি গড়িয়া লইতে হয়। যজমানের বাড়ীতে যে গার্হপত্য সারাদিন জ্বলে, সেই আগুনে দুইখানা অরণি তপ্ত করিয়া আনা হয়। ইহার নাম অগ্নি সমারোপণ। সেই অরণি ঘর্ষণে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন গার্হপত্য জ্বালা হয়। যজমানের বাড়ীর গার্হপত্য এবং এই নূতন গার্হপত্য যে একই অগ্নি, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝান হইল। এই নূতন গার্হপত্য হইতে নূতন আহবনীয় ও নূতন দক্ষিণাগ্নি যথাবিধি জ্বালান হয়। সোম যাগের আনুষঙ্গিক সমস্ত ইষ্টি যাগ এই অগ্নিতেই সম্পাদ্য। এইরূপ অগ্নি স্থাপনের পর যজমানের দীক্ষা গ্রহণ। যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সপত্নীক যজমান ক্ষৌরকার্য্যান্তে স্নান করিবেন। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া কুশের উপর দাঁড়াইয়া নবনী মাখিবেন, চোখে কাজল পরিবেন, কুশের দ্বারা গা মাজিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন, আঙ্গুল গুটাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন; যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত বাহিরে আসিবেন না। সেইখানে একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। এই ইষ্টি যাগের নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। দীক্ষার অনুকূল বলিয়া নাম দীক্ষণীয়। যাগের পর যজমান

কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তদুপরি বসিবেন। তৃণ ও শণে নির্ম্মিত মেখলা পরিবেন; মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন; কাপড়ের খুঁটায় একটা হরিণের শিঙ বাঁধিয়া হাতে ডুম্বর শাখার দণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই যজমানের পরিচ্ছদ। যজমানপত্নীর বেশ ভূষা প্রায়ই তদ্রূপ; উষ্ণীষের বদলে তিনি মাথায় জাল পরেন। এই সকল বেশ ভূষার একটা তাৎপর্য্য আছে। দীক্ষাকর্ম্মে যজমান নূতন জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞশালাটাই তাঁহার পক্ষে মাতৃগর্ভস্বরূপ। সেইখানে ভ্রূণস্বরূপে তাঁহাকে যজ্ঞকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে হয়। যজ্ঞান্তে তিনি সেই গর্ভ হইতে নূতন মানুষ হইয়া বা নবজীবন পাইয়া নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁহার বেশ ভূষার কোন্‌টার কি তাৎপর্য্য, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বুঝাইয়াছেন। যথা, গর্ভমধ্যে ভ্রূণ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে, এই জন্য যজমানও মুষ্টি বদ্ধ করেন, ইত্যাদি। দীক্ষা উপলক্ষে যে ইষ্টি যাগ হয়, তাহার দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু। অগ্নি সকল দেবতার নিম্নে এবং বিষ্ণু সকলের ঊর্দ্ধে; অতএব উঁহাদের দুইজনের যাগ করিলেই সকল দেবতার উদ্দেশে যাগ হয়। এই দুই দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি প্রায়ই পূর্ণমাস যাগের মত। দীক্ষিত যজমানকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদু বাক্য বলিবেন, সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন দেখিবেন না; জলে প্রবেশ করিবেন না; বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। ভোজন-সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে। দীক্ষার পূর্ব্বে পেট ভরিয়া ইচ্ছামত খাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু তার পর হইতে নিয়মের বাঁধাবাঁধি। তদবধি দুই বেলা কেবল দুধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম ব্রত এবং সেই দুগ্ধপানের নাম ব্রতপান। একবার শেষ রাত্রিতে, একবার মধ্যাহ্নে, দুগ্ধপান চলে। দুধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ আসল সোম যাগের দিনে সেই দুগ্ধপানও নিষিদ্ধ। সেই দিন যজ্ঞের হবিঃশেষই একমাত্র ভক্ষ্য।

দ্বিতীয় দিন।—এই দিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টি যাগ; ইহার নাম প্রায়ণীয় ইষ্টি। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ। এই ইষ্টির দেবতা পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা এবং সর্ব্বশেষে অদিতি। দেবতারা অদিতিকে এক সময়ে বর দিয়াছিলেন, তোমাকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। তদবধি সোম যজ্ঞের আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগ। অদিতিকে চরু দিতে হয়; আর চারি জনকে আজ্য দিতে হয়।

এই যাগের পর সোমক্রয়। যজ্ঞশালার বাহিরে সোমবিক্রেতা সোম লইয়া বসিয়া থাকে; তাঁহার নিকট মূল্য দিয়া সোম ক্রয় করিতে হয়। আগে বলিয়াছি, সোমলতা দুষ্প্রাপ্য; পর্ব্বত হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া যজ্ঞের জন্য বিক্রয় একদল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। সোমবিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সোমলতা বেচিত। এই সোম-ক্রয় ব্যাপারে একটু কৌতুক আছে। সোম এককালে গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন; দেবতারা কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রী-প্রিয়। দেবগণ কুমারী বাগ্দেবীকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন এবং নিজেও পলাইয়া আসেন। সোমক্রয় অনুষ্ঠানে সেই ঘটনার অভিনয় হয়। ঋত্বিক্‌দের সহিত যজমান একটি ছোট বৎসতরী লইয়া সোমবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হন। ঐ সোমবিক্রেতা গন্ধর্ব্বস্থানীয় এবং বাছুরটি বাগ্‌দেবতা। কিছু-ক্ষণ দর দস্তর করিয়া বাছুরটিকে মূল্য স্বরূপ দিয়া সোম খরিদ করা হয়। সোম হস্তগত হইলে হঠাৎ লাঠি বাহির করিয়া সোমবিক্রেতাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় এবং বাছুরটি কাড়িয়া লওয়া হয়। গন্ধর্ব্বটার সবই গেল; সোমও গেল, বাগ্‌দেবীকেও সে পাইল না। যজমান সোমলতা কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেন। যজমান এবং অধ্বর্য্যু গাড়ীর উপর বসিয়া থাকেন; হোতা ঋক্‌মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং সুব্রহ্মণ্যা নামক ঋত্বিক্ গাড়ী চালাইয়া প্রাগ্‌বংশশালা ঘুরিয়া ভিতরে

উপস্থিত হন। সেখানে গাড়ী হইতে সোমকে নামাইয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সোম দেবতাগণের একজন রাজা। রাজা অতিথিরূপে বাড়ী আসিলে তাঁহার সমাদর করিতে হয়। রাজা সোম অতিথিরূপে যজমানের যজ্ঞ-শালায় আসিয়াছেন; এখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি ইষ্টি যাগ করিতে হইবে। ইহার নাম আতিথ্য ইষ্টি। এই যাগের দেবতা বিষ্ণু; হব্য দ্রব্য পুরোডাশ। ইহাতে একটু বিশেষ বিধি আছে যে, যাগের পূর্ব্বে মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে মিশাইতে হয়। পূর্ণমাসাদি ইষ্টি যাগে অগ্নিমন্থনের দরকার হয় না। আতিথ্য ইষ্টির পর প্রবর্গ্য যজ্ঞ, আর উপসৎ ইষ্টি। এই সময়ে যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিক্ একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে এক মত হইয়া কর্ম্ম করিব; পরস্পর বিরোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূনপত্র। অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে দেবতারা এইরূপে ঘৃত স্পর্শ করিয়া পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। এখন যেমন ইউরোপের মিত্র রাষ্ট্রগুলি জর্ম্মনির বিরুদ্ধে সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, কতকটা তদ্রূপ। উপসৎ ইষ্টির সমকালে সোমলতাকে টাট্‌কা রাখিবার জন্য সোমে জলের ছিটা দেওয়া হয়। ইহার নাম সোমের আপ্যায়ন কর্ম্ম। আপ্যায়নের পর সোমের নিহ্নব বা পূজা। প্রস্তরের নাম আপনাদের মনে থাকিতে পারে। ইষ্টি যাগে বেদির উপরে এক আঁটি কুশ থাকে; ইহাই প্রস্তর। যজমান কয়জন ঋত্বিকের সহিত প্রস্তরের উপরে হাত রাখিয়া নিহ্নব মন্ত্র বলেন। দ্যাবা পৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। রাজা সোম দ্যাবা-পৃথিবীর অপত্যস্বরূপ; তাঁহাকে প্রণাম করিলে সোমেরই পূজা হয়।

আতিথ্যেষ্টির পরে প্রবর্গ্য, আর উপসৎ ইষ্টি। তন্মধ্যে প্রবর্গ্যের কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। ইহা যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাক্-ছাড়া। এই কর্ম্মে আহুতির দ্রব্যের নাম ঘর্ম্ম। তপ্ত ঘৃতে ছাগলের ও গরুর দুধ

মিশাইয়া গরম করিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। দেবতার নামও ঘর্ম্ম দেবতা। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দ হইতেই আমাদের বাঙ্গালা গরম শব্দ আসিয়াছে। দুধ গরম গরম দিতে হয় বলিয়া উহার নাম ঘর্ম্ম। মাটির ভাঁড়ে ঘর্ম্ম পাক হয়; সেই ভাঁড়ের নাম মহাবীর। পুরোডাশও দিতে হয়, এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। ঘর্ম্ম পাকের জন্য পৃথক্ অগ্নিস্থান থাকে। গার্হপত্যের আগুন আনিয়া সেই আগুন জ্বালা হয়। অধ্বর্য্যু আর দুই জন ঋত্বিকের সহিত আগুনে হাওয়া দেন; প্রস্তোতা নামক সামগায়ী ঋত্বিক্ সাম গান করেন। হোতা ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন; অধ্বর্য্যু আগুনের উপরে তপ্ত মহাবীরে ঘি ঢালেন। তার পর রৌহিণ পুরোডাশ আহুতি দিয়া আসিয়া অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন; প্রতিপ্রস্থাতা ছাগী দোহন করেন। প্রস্তোতা আর এক প্রস্থ সাম গান ও হোতা আর এক প্রস্থ ঋক্ পাঠ করেন। একখানি প্রকাণ্ড কাঠের হাতা থাকে, তাহার নাম উপযমনী। এই হাতায় তপ্ত মহাবীর নামাইয়া রাখিতে হয় এবং মহাবীরের তপ্ত ঘৃতে সেই ছাগ দুগ্ধ ও গো দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে একটা আহুতি দেন; এবং অগ্নির উদ্দেশে আর একটা আহুতি দেন। হোতা যথাবিধি যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। তবে ঘর্ম্মের কিয়দংশ হবিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিতে হয়। হবিঃশেষ ভক্ষণের পূর্ব্বে আর একখানি রৌহিণ পুরোডাশের আহুতি হয়। ইহাই প্রবর্গ্য কর্ম্ম। এই প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজমানের নূতন জন্মলাভে সাহায্য করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই ঘর্ম্মাহুতির দ্বারা যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে দেবতারূপে উৎপন্ন হন। প্রবর্গ্য কর্ম্মের পর উপসৎ। উপসৎ ইষ্টি যাগ; দেবতা অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু। আহুতি আজ্য। অসুরেরা তিন লোক জয় করিয়া ঐ তিন লোককে সোণা, রূপা ও লোহার প্রাকারবেষ্টিত করিয়া পুরীতে বা দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। দেবতারা ঐ তিন পুরীর সমীপে আসন্ন হইয়া পুরী তিনটিকে অবরোধ

করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসুরদিগের প্রতি যে বাণ ছুড়িয়াছিলেন, তাহাই উপসদ্—উপ অর্থাৎ সমীপে, সদ্ ধাতুর অর্থ আসন্ন হওয়া। ঐ বাণে অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু, এই তিন দেবতা অবস্থিত ছিলেন। তাহাতেই অসুরদের পরাজয় হয়। এই ত্রিপুর-জয়-কাহিনী আপনাদিগকে পৌরাণিক ত্রিপুরজয়ের কথা স্মরণ করাইবে।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নেই এই প্রবর্গ্য এবং উপসৎ অনুষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নেও আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ হইবে। উপসৎ করিতে হইলেই অসুর জয়ে দেবগণের সন্ধিবন্ধনের অনুরূপ তানূনপত্র করিতে হইবে এবং জলের ছিটা দিয়া সোমের আপ্যায়ন করিয়া সোমের নিহ্নব বা পূজাও করিতে হইবে। তৃতীয় দিনের পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্য এবং উপসৎ এবং অপরাহ্নে আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ। উপসদের সঙ্গে তানূনপত্র, সোমের আপ্যায়ন এবং নিহ্নব দ্বিতীয় দিনের মতই। এই তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে সোম যাগের জন্য মহা বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়।

চতুর্থ দিন। চতুর্থ দিন পূর্ব্বাহ্নেই দুইবার প্রবর্গ্য ও দুইবার উপসৎ সারিয়া ফেলিয়া অন্য আয়োজন করিতে হইবে। প্রথম কাজ, অগ্নি-প্রণয়ন। ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে আগুন আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রাখিতে হইবে। তদবধি এই নূতন অগ্নিই সোম যজ্ঞের আহবনীয় রূপে গণ্য হয়; পুরাতন আহবনীয়টা গার্হপত্য হইয়া যায়। অগ্নিকে লইয়া যাইবার সময় হোতা মন্ত্র পাঠ করেন। তার পরের কাজ হবির্দ্ধান-প্রবর্ত্তন। দুইখানি টপ্পর দেওয়া গরুর গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান; সোম যজ্ঞে প্রধান হবিঃ সোম; সেই সোম এই গাড়ীর উপরে রাখা হয় বলিয়া গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। যজমানের পত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইয়া দেন; অধ্বর্য্যু এক গাড়ীতে, প্রতিপ্রস্থাতা অন্য গাড়ীতে চাপিয়া মহাবেদির দিকে চালাইয়া দেন। গাড়ী ঘর্ ঘর্ করিয়া চলিতে থাকে; হোতা এবং যজমান মন্ত্র পাঠ করেন। মহাবেদির উপরে পৌছিলে, গাড়ী দুইখানি

পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপরে চালা বাঁধা হয়; এই চালারই নাম হবির্দ্ধান মণ্ডপ। তার পশ্চিম দিকে আর একটি চালা তৈয়ার হয়; উহারই নাম সদঃশালা; মহাবেদির দুই পার্শ্বে দুইখানি ছোট ঘর তৈয়ার হয়, উহাই আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালায় ছয়টি, আর আগ্নীধ্রীয়ে একটি, এই সাতটি ধিষ্ণ্য তৈয়ার করিতে হইবে; ধিষ্ণ্যের অর্থ অগ্নিস্থান; ইহার পাশে ঋত্বিকেরা সোমাহুতিকালে মন্ত্রপাঠ করিবেন। এই ধিষ্ণ্যের জন্যও ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয়ে ধিষ্ণ্যে রাখিতে হইবে; পরদিন সেই অগ্নি হইতে আর আর ধিষ্ণ্য জ্বালান হইবে। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নি আনয়নের পর সোমের আনয়ন। আপনাদের মনে থাকিবে, দ্বিতীয় দিবসে সোম ক্রয় করিয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে কাঠের আসনে রাখা হইয়াছিল; দুই বেলা জলের ছিটা দিয়া তাহাকে টাটকা রাখা হইয়াছিল। আজ সেই সোমকে সেখান হইতে তুলিয়া পূর্ব্ব মুখে আনিয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপে গাড়ীর উপরে রাখিতে হয়। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নির ও সোমের আনয়নের নাম অগ্নীষোম-প্রণয়ন। সকল কর্ম্মেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

অগ্নি এবং সোম উভয়কেই মহাবেদিতে স্থাপন করা হইল। ইহাঁরা উপস্থিত না হইলে সোম যাগ হইতে পারে না। অগ্নি এবং সোম উভয়েই দেবতা; এখন ইঁহাদের উদ্দেশে একটি পশুযাগ আবশ্যক। এই চতুর্থ দিনেই সেই পশু যাগ করিতে হইবে; কেবল ইষ্টি যাগে কুলাইবে না। অগ্নি এবং সোমের উদ্দিষ্ট এই পশুটির নাম অগ্নীষোমীয় পশু। পশুটি মোটাসোটা হওয়া আবশ্যক। এই পশুর মাংস ভক্ষণ করিলে নরমাংস ভক্ষণ হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল; গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। পশুযাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি—যূপচ্ছেদন হইতে যাগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই করিতে হয়। পশুযাগ সমাপ্ত করিতে অপরাহ্ণ আসিয়া পড়ে। পরদিন প্রকৃত সোমযাগের দিন—

এ কয়দিন তাহার আয়োজন উদ্যোগেই গেল। সোম যাগের জন্য সোম লতা ছেঁচিয়া সোম রস বাহির করিতে হয়—তার জন্য জলের দরকার। এই চতুর্থ দিনেই সন্ধ্যাকালে সেই জল আনিয়া রাখিতে হইবে। স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাজনা বাজাইয়া সমারোহে নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া রাখা হয়। এই জলেরও একটা নাম আছে—নাম বসতীবরী। অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অতএব তাহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। এই বসতীবরী জল এবং হবির্দ্ধানে স্থিত সোমলতাকে রাত্রিকালে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপ মধ্যে রাখা হয় এবং যজমান রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন।—উদ্যোগ আয়োজনে চারি দিন গেল। পঞ্চম দিনে প্রকৃত সোম যাগ। সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রস জলে মিশাইয়া আহুতি দিতে হইবে। সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করার নাম অভিষব। পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে তিন বার সোমের অভিষব এবং সোমের আহুতি হয়। সোমাভিষব এবং সোমাহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, এক যোগে সমুদায় কর্ম্মের নাম সবন। পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্ণে তৃতীয় সবন। সোম যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটী পশু যাগও বিহিত। ইহার পূর্ব্বদিন একটী পশু যাগ হইয়া গিয়াছে,—অগ্নীষোমীয় পশু যাগ;—এ দিন আর একটী পশু যাগ হয়। এই পশুযাগের নাম সবনীয় পশু যাগ। তিন সবনে তিনটী পশু যাগ হয় না। সারা দিনে একটী। একই পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাগ করিয়া তিন সবনে আহুতি দেওয়া হয়। আগে বলিয়াছি, পশুযাগের সঙ্গে পুরোডাশ-যাগও থাকে। সবনীয় পশুযাগে পুরোডাশ ত থাকেই, তা ছাড়া আরও কয়েকটী দ্রব্যের আহুতি হয়। যথা, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ এবং পয়স্যা। ধানা অর্থে ঘিয়ে ভাজা যব; করম্ভ ঘৃতপক্ক যবের ছাতু; পরিবাপ ঘৃতপক্ক চাল ভাজা। দুধে দই মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। সোমরস, পশুমাংস,

এবং যবভাজা প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চমকারের অন্তর্গত মদ্য, মাংস ও মুদ্রা আপনাদের মনে আসিবে। আপনারা দেবতাদের রুচির প্রশংসা করিবেন।

পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী জল আনিয়া রাখা হইয়াছে, এবং যজমান পাহারা দিয়া জাগিয়া আছেন। অতি প্রত্যূষে তিনি ঋত্বিক্-দিগকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলেন। হোতা প্রাতরনুবাক নামক ঋগ্‌মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অগ্নি, উষা এবং অশ্বিদ্বয় এই সকল মন্ত্রের দেবতা। বহু ঋক্ পাঠ ক রিতে হয়। পাখী ডাকিলে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হয়। কাজেই আবশ্যকমত শতাধিক বা সহস্রাধিক মন্ত্র পড়িতে হয়। বহু মন্ত্র পাঠে যজ্ঞেশ্বর প্রজাপতি সন্তুষ্ট হন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে যজমান ও তাঁহার পত্নী কয়েকজন ঋত্বিক্ এবং পরিচারক সঙ্গে জলাশয় হইতে জল আনিতে যান। কলসীতে করিয়া জল আনেন। এই জলের নাম একধনা। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় বসতীবরী আনা হইয়াছিল; অদ্য প্রত্যূষে একধনা আনা হইল। এই দুই জল খানিকটা মিশাইয়া তৃতীয় জল হয়, তাহার নাম নিগ্রাভ্য। বসতীবরী, একধনা এবং নিগ্রাভ্য এই তিন জলই সোম-রস প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক।

এইবার সোমাভিষবের অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস-নিষ্কাশনের আয়োজন। পূর্ব্ব দিনে হবির্ধান গাড়ীর নীচে চারিটী গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গর্ত্তের নাম উপরব। গর্ত্তের উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিতে হয়; পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। পাষাণের আঘাত হয়, আর উপরবের গর্ত্ত হইতে গম গম শব্দ হইতে থাকে। অধ্বর্য্যু, আর তিন জন ঋত্বিক্ পাষাণ হাতে করিয়া রস বাহির করেন। সোমের টুকরাগুলি মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ ছিবড়া বাহির না হয়, ততক্ষণ রস বাহির করিতে হয়। তিন

সবনেই এইরূপ করিতে হয়। প্রাতঃসবনে এবং মাধ্যন্দিন সবনে প্রচুর রস আবশ্যক। সেই জন্য প্রাতঃসবনে সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিতে হয়। মাধ্যন্দিনেও প্রায় বাকি অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়। এক খানা বড় টুকরা তৃতীয় সবনের জন্য রাখা হয়। সেই খানা ছেঁচিয়া যে রসটুকু পাওয়া যায়, তৃতীয় সবনের পক্ষে তাহাই প্রচুর। এইরূপে নিষ্কাশিত সোমরস বসতীবরী এবং একধনা এই দুই জলে মিশাইলে আহুতির জন্য রস প্রস্তুত হয়। রস রাখিবার জন্য তিনটী বড় বড় কাঠের গামলা বা কলস থাকে। একটীর নাম আধবনীয়, একটীর নাম দ্রোণকলস, আর একটীর নাম পূতভৃৎ। আধবনীয়ে বসতবরী এবং একধনা দুই জল ঢালিয়া তাহাতেই নিষ্কাশিত সোমরস মিশান হয়। এইরূপে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। দ্রোণকলসের মুখে মেষ লোমের ছাঁকনি রাখিয়া আধবনীয়ের জল ঢালিয়া ছাঁকিতে হয়। এইরূপে ছাঁকিলে সোমরস পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। ছাঁকা সোমের নাম হয় পবমান সোম। এই বিশুদ্ধ সোমরসের অর্দ্ধেক দ্রোণকলসে এবং অর্দ্ধেক পূতভৃতে রাখা হয়। পূত-ভৃতে রাখিবার সময় একটু আড়ম্বর আছে; পরে বলিব। সোম যাগে বহু দেবতাকে আহুতি দিতে হয়। এক এক আহুতিতে যতটুকু সোমরস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম গ্রহ। সোমরস ছোট ছোট পাত্রে লইয়া আহুতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাত্রে একবারে যাহা লওয়া হয়, তাহাই গ্রহ। তিন শ্রেণির পাত্র আবশ্যক। প্রথম শ্রেণির পাত্রকে পাত্রই বলে; সংখ্যা এগার খানি। দ্বিতীয় শ্রেণির পাত্রের নাম চমস; সংখ্যায় দশখানি। এইবার যাগের আরম্ভ।

(১) প্রথমে প্রাতঃসবন। প্রথমাহুতি সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যু এক খানি পাত্রে কিঞ্চিৎ রস লইয়া উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। ইহা যাগ নহে, হোম। অধ্বর্য্যু নিজেই একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দেন। উপাংশু অর্থাৎ

অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পড়া হয় বলিয়া হোমের নাম উপাংশু হোম। যে রসটুকু দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু গ্রহ। যে পাত্রে করিয়া দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু পাত্র। সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় সূর্য্যেরই উদ্দেশে অন্তর্যাম হোম। ইহাও হোম। অন্তর্যাম পাত্রে অন্তর্যাম গ্রহ লইয়া যজুর্মন্ত্র সহিত আগুনে দেওয়া হয়। এই হোমের পর ঋত্বিকেরা মহা বেদির বাহিরে আসিয়া পূতভৃতে ঢালিবার জন্য সোম ছাঁকেন। দ্রোণকলসে সোম আগেই ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছে। পূতভৃতে সোম ছাঁকার আড়ম্বর আছে। এক দিকে সোম ছাঁকা হইতেছে, অন্য দিকে সেই পবমান সোমের উদ্দেশে উদ্গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করিতেছেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান স্তোত্রগান। পবমান সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া নাম পবমান-স্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে আসিয়া গীত হয় বলিয়া নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। তৎপরে তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহাহুতি তিন জোড়া দেবতার উদ্দিষ্ট। প্রথম আহুতি ঐন্দ্রবায়ব :অর্থাৎ ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় আহুতি মৈত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। তৃতীয় আহুতিটি আশ্বিন অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু যথাক্রমে এই তিন গ্রহ আহুতি দেন। এবার হোম নহে; রীতিমত যাগ। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা মন্ত্র এবং হোতা স্বয়ং যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন। বষট্‌কারের পর অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ। আহুতি-দাতা অধ্বর্য্যু এবং বষট্‌কর্ত্তা হোতা উভয়ে একযোগে প্রত্যেক গ্রহের শেষাংশ পান করেন। পান অনাবশ্যক; ঘ্রাণ মাত্রেই ভক্ষণ হয়; বড় জোর ঠোঁট ভিজাইতে হয়। তৎপরে শুক্র গ্রহ এবং মন্থি গ্রহের আহুতি। উভয়ই ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট; অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থি গ্রহ গ্রহণ করিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান; এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠের পর বষট্‌কারের সময় আগুনে দেন। হোমকর্ত্তা

ও বষট্‌কর্ত্তা একত্র গ্রহশেষ পান করেন। এবার ঘ্রাণমাত্রে চলে না; রীতিমত পান করিতে হয়। শুক্র এবং মন্থি এই দুই গ্রহ আহুতির পর বলা হয় "নিরস্তঃ শণ্ড নিরস্তো মর্কঃ।" তাৎপর্য্য, এতদ্দ্বারা শণ্ড এবং মর্ক এই দুই অসুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আপনারা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের শণ্ডামার্ক নামে দুই পুত্রের পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়াছেন। শুক্র শব্দের অর্থ উজ্জ্বল; উহা সোম রসের চলিত বিশেষণ। শুক্র পাত্রে রক্ষিত সোমরসকে বিশেষতঃ শুক্র গ্রহ বলা হয়। কোনরূপে এই শুক্র গ্রহের সহিত আকাশস্থ শুক্র গ্রহের—planet Venusএর—একীকরণ হইয়া থাকিবে। Planet Venus আকাশস্থ planetগণের সকলের চেয়ে উজ্জ্বল। তাহা হইলে মন্থি গ্রহ কে হয়? মহাত্মা গঙ্গাধর টিলক অনুমান করেন একই planetএর দুই নাম, শুক্র এবং মন্থি। একটি morning star, আর একটি evening star.

সোমাহুতির জন্য তিন রকম পাত্রের কথা বলিয়াছি। এক শ্রেণির পাত্রের নাম চমস। যজমান এবং ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে নয় জন, এই দশ জনের জন্য দশখানি চমস নির্দ্দিষ্ট থাকে; ইহাঁদের নাম এই জন্য চমসী। এক এক খানি চমস এক এক জন চমসাধ্বর্য্যুর জিম্বায় থাকে। চমসাধ্বর্য্যু সোমরসে চমস পূর্ণ করিয়া চমসীদের হাতে দেন। ধিষ্ণ্য নামক অগ্নিস্থানের কথা বলিয়াছি—সেই ধিষ্ণ্যগুলি আজ জ্বালান হইয়াছে। এক একটি ধিষ্ণ্য এক এক জন চমসীর নির্দ্দিষ্ট। চমসীরা আপন আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া অনুবাক্যা এবং যাজ্যা পাঠের পর বষট্‌কার করেন। অধ্বর্য্যু তাঁহাদের প্রত্যেকের হাত হইতে চমস লইয়া সেই চমসের সোম অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। হবিঃশেষ ভোজনের জন্য রক্ষিত হয়। তার পর সেই হবিঃশেষ পানের ধূম লাগিয়া যায়। যজমান ও ঋত্বিকেরা সদঃশালায় প্রবেশ করিয়া হুতাবশিষ্ট সোম রস পান করেন। সোমপান বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি আছে। সকল কথা তুলিয়া আপনাদিগকে ত্যক্ত করিব না।

সোমাহুতির পাত্রের মধ্যে দুইখানি পাত্রের নাম ঋতু পাত্র; একখানি অধ্বর্য্যুর জন্য; একখানি প্রতিপ্রস্থাতার জন্য। ঋতুপাত্র পূর্ণ করিয়া অধ্বর্য্যু ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয় বার এবং প্রতিপ্রস্থাতা ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয়বার সোমাহুতি দেন। যাজ্যা পাঠ করেন কোন বার হোতা, কোন বার অন্য ঋত্বিক্। আহুতির পর আহুতিদাতা, ও বষট্‌কর্ত্তা হবিঃশেষ পান করেন।

আপনারা বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে চলিবে না। প্রাতঃ-সবনের প্রধান আহুতির কথাই এখনও বলা হয় নাই। এই প্রধান আহুতি তিনটি; নাম যথাক্রমে ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্‌থ্য আহুতি। আহুতিকালে যাজ্যা মন্ত্রের পূর্ব্বে একটি ঋগ্‌মন্ত্র,—অনুবাক্যা মন্ত্র,—পাঠ করাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই তিন আহুতিতে যাজ্যার পূর্ব্বে বহু ঋক্ পড়িতে হয়। এই ঋক্ সমূহের নাম শস্ত্র। ঐ সকল মন্ত্রে দেবতার শংসন বা প্রশংসা হয়, সেই জন্য মন্ত্র সমূহের নাম শস্ত্র। হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক, এই চারি ঋত্বিকের শস্ত্রপাঠে অধিকার আছে। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করেন; ইহার নাম স্তোত্রগান। আগে স্তোত্রগান, তার পর শস্ত্রপাঠ। সদঃশালায় একটা ডুমুরের ডাল পোঁতা থাকে, আগে বলিয়াছি—উহার নাম ঔডুম্বরী। স্তোত্রগানের সময় গায়কেরা ঔডুম্বরী স্পর্শ করিয়া গান করেন। স্তোত্রগানের এবং শস্ত্রপাঠের কতকগুলি খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। যিনি শস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি আপনার ধিষ্ণ্যের পাশে পূর্ব্ব মুখে বসেন। আর যিনি আহুতি দিবেন, তিনি শস্ত্রপাঠককে পিছনে রাখিয়া দুই হাতে ও দুই পায়ে ভর দিয়া চতুষ্পদের মত অগ্নির সম্মুখে বসিয়া থাকেন। শস্ত্রপাঠক প্রথমে "স্তু মৎ পদ্ বক্ দে পিতা মাতরিশ্বা" ইত্যাদি একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। তার পর তিনি আহুতিদাতাকে

আহ্বান করিয়া আহাব মন্ত্র পাঠ করেন। প্রাতঃসবনের আহাব মন্ত্র "শোংসাবোম্"। অর্থ, আমরা উভয়ে শংসন করি বা শস্ত্র পাঠ করি। আহুতিদাতা তাহার উত্তরে বলেন—"শংসামোদৈবোম্" অর্থাৎ তুমিই শংসন কর, তাহাতে আমোদ হইবে। এই উত্তরের নাম প্রতিগর। তাহার পর শস্ত্রপাঠক তূষ্ণীংশংস নামক আর একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। প্রাতঃসবনে তূষ্ণীংশংস "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ"। তার পর শস্ত্রপাঠক শস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন। শস্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি ঋগ্‌মন্ত্র; কিন্তু তদতিরিক্ত কতকগুলি যজুর্মন্ত্রও সেই সঙ্গে পড়িতে হয়। এই গুলির নাম নিবিং মন্ত্র। শস্ত্র পাঠের পর তিনি বলেন "উক্‌থং বাচি"; অর্থাৎ আমার বাক্যে উক্‌থ বা শস্ত্র পাঠ হইল। অধ্বর্য্যু তাহার উত্তরে বলেন "উক্‌থশাঃ যজ সোমস্য"—উক্‌থ পাঠ হইয়াছে, এখন সোমাহুতির যাজ্যা পাঠ কর। অধ্বর্য্যুর এই আদেশ পাইয়া শস্ত্রপাঠক যাজ্যা পাঠ করেন। "যে যজামহে" বলিয়া যাজ্যা পাঠ আরম্ভ হয়, তাহার পর বৌষট্ উচ্চারণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু এই সময়ে খানিকটা সোমরস আহুতি দেন। শস্ত্রপাঠক আবার বলেন "সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্"—অগ্নি তুমি সোম ভক্ষণ কর ও বহন কর। এই দ্বিতীয় বার বৌষট্ উচ্চারণের নাম অনুবষট্‌কার। অনুবষট্‌কারের পর অধ্বর্য্যু আবার খানিকটা সোম আহুতি দেন। আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আহুতিদাতা এবং শস্ত্রপাঠক উভয়ে মিলিয়া পান করেন। ইহাই শস্ত্র-পাঠের পর সোমাহুতির সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক আহুতির পরে চমসীরা সোমাহুতি দেন ও চমসস্থ সোম পান করেন।

ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব, এবং উক্‌থ্য এই তিনটি আহুতির কথা বলিয়াছি। প্রথম দুই গ্রহের আহুতিদাতা অধ্বর্য্যু; শস্ত্রপাঠক হোতা। উক্‌থ্য গ্রহ তিন অংশে আহুতি দেওয়া হয়। শস্ত্রপাঠক যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। ইহাঁরা তিন জনেই হোতার সহকারী।

প্রাতঃসবন সমাপ্ত হইল। পরে মাধ্যন্দিন সবন। মাধ্যন্দিন সবনের অনুষ্ঠান প্রাতঃসবনের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু হোম নাই, অন্তর্যাম হোম নাই, দ্বিদেবত্য যাগ নাই, ঋতুগ্রহ যাগও নাই। শুক্র গ্রহ ও মন্থি গ্রহের যাগ আছে। উহার সঙ্গে চমসাহুতি আছে। এই সব আহুতির পর তিন প্রধান আহুতি—তজ্জন্য যথারীতি শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান। প্রথম দুই আহুতির নাম মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র—স্তোত্রগানের পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। তৃতীয় আহুতি উক্‌থ্য তিন অংশে দেওয়া হয়। শস্ত্র পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। মাঝে মাঝে চমসাহুতি পূর্ব্ববৎ।

তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু ও অন্তর্যাম হোম নাই। দ্বিদেবত্য নাই, ঋতুগ্রহ নাই, শুক্র, মন্থি পর্য্যন্ত নাই। এই সকলের পরিবর্ত্তে আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহের এবং পাত্নীবত গ্রহের আহুতি আছে। স্তোত্রগান এবং শস্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রধান আহুতি দুইটি; বৈশ্বদেব এবং অগ্নি মারুত। তাহার মাঝে মাঝে চমসাহুতি।

এই সকল আহুতিতে সোমরস প্রায়ই ফুরাইয়া আসে! যে একটু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ধানা বা যব ভাজা মিশাইয়া মাথায় লইয়া উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ আহুতি দেন; হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। ইহার নাম হারিযোজন গ্রহ। ইহাতে শস্ত্র পাঠ নাই। এই খানে সোমাহুতির সমাপ্ত হইল। পশু যাগের যে সকল অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া তৃতীয় সবন সমাপ্ত করা হয়। যজমানের সহিত ঋত্বিকেরা এখন সামগান শুনিতে শুনিতে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোম যাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বরুণ দেবতাকে একটা পুরোডাশ দিয়া সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, এবং দীক্ষাকালে যে সকল বেশভূষা করিয়াছিলেন, তাহাও ত্যাগ করেন। যজমান এখন সোমযজ্ঞে পুনর্জন্ম পাইলেন। এখনও কিন্তু খালাস নাই।

অবভৃথ স্নানের পর যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিয়া আর একটি ইষ্টি যাগের প্রয়োজন। দীক্ষার পর দিন প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল। উদয়নীয়ে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হয়। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ; উদয়ন শব্দের অর্থ সমাপ্তি। উদয়নীয় যাগের পদ্ধতি সর্ব্বাংশে প্রায়ণীয়েরই মত। যজ্ঞের আরম্ভ এবং শেষ এক রকমের করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, সমস্ত যজ্ঞটা একগাছা লম্বা দড়ি; প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়, এই দুই ইষ্টি যাগের দ্বারা এই দড়ির দুই প্রান্তে গিঁঠ দিয়া দড়িকে শক্ত করা হয়।

আপনারা মনে করিতেছেন, এইবার অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এখনও অব্যাহতি পাইবেন না। ইষ্টি যাগের পর আর একটি পশু যাগ করিতে হইবে। বন্ধ্যা গাভী, তদভাবে একটি বৃষ দ্বারা পশু যাগ হইবে। ইহার নাম অনুবন্ধ্যা পশু যাগ। পশুযাগের পর নূতন করিয়া মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে আবার একটি ইষ্টি যাগ। ইহার নাম উদবসানীয় ইষ্টি যাগ। এই যাগে অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ দিতে হয়। এইবার সত্যসত্যই অব্যাহতি। যজমান ঐ ইষ্টি যাগ সমাপনের পর সন্ধ্যা-কালে দেবযজন-ভূমি হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

অগ্নিষ্টোমের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে তাহার ক্রম মনে রাখা আপনাদের কঠিন হইবে। আর একবার অতি সংক্ষেপে আওড়াইব; তাহাতে মনে রাখিবার সুবিধা হইতে পারে।

অগ্নিষ্টোমে সোমাহুতি এক দিনে সম্পাদ্য; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চারি দিন যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে হয়; সমুদয় কার্য্যে পাঁচ দিন লাগে। প্রথম দিনে সপত্নীক যজমানের দীক্ষা এবং সেই প্রসঙ্গে দীক্ষণীয় ইষ্টি যাগ। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে যজ্ঞের আরম্ভ সূচনায় প্রায়ণীয় ইষ্টি যাগ। পরে সোম ক্রয় করিয়া যজ্ঞশালায় সোমের আনয়ন, এবং সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ আতিথ্য ইষ্টি যাগ। আতিথ্যের পর পূর্ব্বাহ্ণেই প্রবর্গ্য

যজ্ঞ এবং উপসদিষ্টি যাগ। এই সময়ে তানূনপত্র দ্বারা যজমান ও ঋত্বিক্‌দের সন্ধিবন্ধন। উপসদের সঙ্গে সোমে জলের ছিটা দিয়া আপ্যায়ন ও সোমের পূজার জন্য নিহ্নব পাঠ। সেদিন অপরাহ্লেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্লেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্লে প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্লেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। মাঝে মহাবেদি-নির্ম্মাণ। চতুর্থ দিনে পূর্ব্বাহ্লেই দুই বার প্রবর্গ্য এবং দুই বার উপসৎ সারিয়া উত্তর বেদিতে অগ্নিপ্রণয়ন। এই অগ্নিতে সোমাহুতি হইবে। অগ্নি প্রণয়নের পর সোম রাখিবার গাড়ী দুইখানির—হবির্দ্ধান শকট দুইখানির—প্রবর্ত্তন অর্থাৎ মহাবেদির উপরে আনয়ন। তার পর অগ্নি ও সোমের প্রণয়ন; অর্থাৎ ধিষ্ণ্য জ্বালিবার জন্য অগ্নি আনয়ন এবং ঐষ্টিক বেদি হইতে সোমের আনয়ন। এই অগ্নি ও সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্নীষোমীয় পশু যাগ। সন্ধ্যার পর বসতীবরী জল আনয়ন। পঞ্চম দিন সোম যাগের দিন। ভোরের বেলায় হোতা প্রাতরনুবাক মন্ত্র পড়েন; এবং ঋত্বিকেরা একধনা জল আনেন, তার পরে সবন আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সবনে সোমের অভিষব হয় অর্থাৎ নিগ্রাভ্যের জলে সোম ছেঁছিয়া বসতীবরী ও একধনার সহিত মিশাইতে হয়; পরে ছাঁকিয়া লইয়া দ্রোণকলস ও পূতভৃৎ পূর্ণ করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বা স্থালীতে এবং চমসে করিয়া এই সোমের আহুতি দেওয়া হয়। অনেক আহুতি হয়;—অন্যান্য আহুতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রধান আহুতিগুলিতে আড়ম্বর আছে। প্রধান আহুতির পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা একযোগে স্তোত্রগান করেন, আর হোতা বা তাঁহার সহকারী ঋত্বিকে শস্ত্র পাঠ করেন। এক এক শস্ত্রমধ্যে বহু ঋক্ থাকে। শস্ত্র পাঠের পর সোমাহুতি ও সোমপান হয়; তৎপরে চমসাহুতি ও চমসপান হয়। তিন সবনেই এইরূপ; তবে প্রাতঃসবনের চেয়ে মাধ্যন্দিন সংক্ষিপ্ত; তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। তিন সবন ব্যাপিয়া একটী পশু যাগ হয়—উহার নাম সবনীয় পশু যাগ।

তিন সবনের পর সপত্নীক যজমানের অবভৃথ স্নান। সেখানে বরুণকে পুরোডাশ দিয়া যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টি যাগ। তৎপরে অনুবন্ধ্য পশুযাগ। পশুযাগের পর মন্থন দ্বারা নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে উদবসানীয় ইষ্টি যাগে যজ্ঞ সমাপ্ত করা হয়।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্ততঃ একশত গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ঋত্বিক্‌দের ভাগ এইরূপ। ব্রহ্মা, উদ্গাতা হোতা, অধ্বর্য্যু এই চারিজন প্রধান ঋত্বিকের প্রত্যেকে বারটি করিয়া আটচল্লিশটি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি। পোতা, প্রতিহর্ত্তা, অচ্ছাবাক ও নেষ্টা প্রত্যেকে চারিটি করিয়া ষোলটি। অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, প্রত্যেকে তিনটি করিয়া বারটি। সমুদয়ে একশতটি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। তদ্ব্যতীত কিছু সোণা, ঘোড়া, বস্ত্র, ছাতু, তিল ইত্যাদিও ঐ অনুপাতে দক্ষিণা দেওয়া হয়। চমসাধ্বর্য্যুরাও যথাসম্ভব দক্ষিণা পান। মাধ্যন্দিন সবনের সময় দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নিষ্টোমের বিবরণ এইখানে সমাপ্ত করিলাম। আপনারা ধীরভাবে শুনিলেন; আপনাদের জয় হউক।

অগ্নিষ্টোমের নানা বিকৃতি আছে; তন্মধ্যে উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র এই তিনটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহি। ইহাদের পদ্ধতি অগ্নিষ্টোমেরই মত; তবে কিছু কিছু বিশেষ বিধি আছে। প্রথমে উক্‌থ্য যাগ। অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুইটি, তাঁহার তিন সহকারীর তিনটি; মাধ্যন্দিন সবনেও পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুই ও সহকারীদের তিন। তৃতীয় সবনে শস্ত্র সংখ্যা দুইটি—হোতাই দুই শস্ত্র পাঠ করেন; সহকারীদের শস্ত্র নাই। কাজেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন সবনে মোটের উপর শস্ত্র সংখ্যা বার। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়; অতএব স্তোত্র-সংখ্যাও বার। আনুষঙ্গিক সবনীয় পশুযাগে একটি মাত্র পশু; উহাই সবনীয় পশু; অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ দিতে হয়।

এই হইল অগ্নিষ্টোম। উক্‌থ্য যজ্ঞের প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন অগ্নিষ্টোমেরই মত। তৃতীয় সবনে হোতার দুই শস্ত্র ব্যতীত হোতার তিন সহকারীর, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জনের, তিন শস্ত্র আছে। কাজেই প্রত্যেক সবনে শস্ত্র সংখ্যা পাঁচ; তিন সবনে পনের। শস্ত্র যখন পনের, স্তোত্রও তখন পনের। সবনীয় পশু দুইটি—অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের উদ্দেশে আর একটি ছাগ। তার পর ষোড়শী যজ্ঞ। ইহাতে উক্‌থ্য যজ্ঞে বিহিত পনেরটি শস্ত্র ত আছেই; তাহার উপর অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র আছে। কাজেই শস্ত্রসংখ্যা ষোল। অতএব স্তোত্রসংখ্যাও ষোল। ষোল বলিয়া যজ্ঞের নাম ষোড়শী। সবনীয় পশু এবার তিনটি; অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। তার পর অতিরাত্র যজ্ঞ; পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞগুলি দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয়; রাত্রিতে কোন কাজ থাকে না। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শীর উপরে অতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। এইজন্য নাম অতিরাত্র; রাত্রিকালে তিন পর্য্যায়ে সোমাহুতি। প্রতি পর্য্যায়ে চারিটি শস্ত্র; হোতার একটি, তাঁহার সহকারী তিন জনের তিনটি—এইরূপে তিন পর্য্যায়ে বারটি শস্ত্র। রাত্রি শেষে আরো একটি শস্ত্র হোতার পাঠ্য। কাজেই ষোড়শীর ষোল শস্ত্রের উপরে এই তেরটি যোগ করিলে মোটের উপর উনত্রিশটি শস্ত্র হয়। অতএব অতিরাত্র যজ্ঞে সমুদয়ে উনত্রিশটি শস্ত্র। অতএব উনত্রিশটি স্তোত্র। সবনীয় পশু চারিটি। অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ এবং তদ্ব্যতীত সরস্বতীর উদ্দেশে একটি ছাগ।

অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র এই সকল সোমযজ্ঞ এক দিনেই শেষ হইবে। দীক্ষা এবং উদ্যোগ আয়োজনে ও আনুষঙ্গিক ইষ্টি যাগাদিতে কয়েক দিন যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত সোম যাগ এক দিনের অনুষ্ঠান; এক দিনেই তিন সবন। কিন্তু বড় বড় সোম যজ্ঞে একাধিক

দিন লাগিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বার দিন অথবা তাহার অধিক দিন ধরিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে সত্র বলিত। দ্বাদশাহ নামক সত্র বার দিনের অনুষ্ঠান; গবাময়ন নামক সত্র সংবৎসরের অনুষ্ঠান। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক বহুবৎসরব্যাপী সত্রানুষ্ঠান করিতেন, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আপনারা শুনিয়াছেন। এই সকল বহুদিনব্যাপী সত্রানুষ্ঠানে প্রত্যহই সোম যজ্ঞ হইত; প্রত্যহই সোমের অভিষব, সোমের আহুতি, ও তৎসহিত পশু যাগাদি হইত। দ্বাদশাহ যজ্ঞে প্রথম দিনে অতিরাত্র ও শেষ দিনেও অতিরাত্র যজ্ঞ; মাঝে কয়েক দিনের কোন দিন বা অগ্নিষ্টোম, কোন দিন উক্‌থ্য, কোন দিন বা ষোড়শী ইত্যাদি যজ্ঞ হইত। সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রও ঐরূপ—প্রথম দিনে অতিরাত্র, শেষ দিনে অতিরাত্র, অন্যান্য দিনে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ। সংবৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত; প্রথম ছয় মাসে যজ্ঞগুলির যে পর্য্যায় ছিল, দ্বিতীয় ছয় মাসে তাহার পর্য্যায় বিপরীত ক্রমে উল্টাইয়া বৎসরের দুই ভাগকে বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে symmetrical করা হইত। এ সকলের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আর কথা বাড়াইলে আমাকে গালি দিবেন। সোম রসে মাদকতা ছিল, কিন্তু আমি সোম যজ্ঞের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে আপনাদের অবসাদ বই উন্মাদনা কিছুই হয় নাই। দুইটা রোচক কথা বলিয়া আমি আজি ছুটি লইব।

আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, সোম লতা যে কোন্ লতা, এ কালে তাহা কেহই জানে না। বেদ এবং আবেস্তা উভয় শাস্ত্রের বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা এক জাতি ওষধি। ওষধি শব্দে বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ বুঝায়;— যে সকল গাছ বৎসরের মধ্যেই জন্মে, বাড়ে ও মরিয়া যায়; পর বৎসর আবার নূতন করিয়া জন্মে, বাড়ে ও মরে। সোমকে ওষধিপতি বলা হয়। সোমের বা সোম রসের বর্ণ ছিল অরুণ, পিঙ্গল; সোমের একটা প্রসিদ্ধ বিশেষণ শুক্র; শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। উহার রসে মিষ্টতা ছিল; উহার

নামান্তর মধু—বেদে ইহাকে বহু স্থলে মধু বলা হইয়াছে; উপরন্তু ইহা মাদকতা জন্মাইত, বাক্যে স্ফূর্ত্তি দিত, গায়ে বল দিত। দেবতারা ইহা পান করিতেন; ইন্দ্র সোম পান করিয়া বৃত্রকে পরাজয় ও বধ করিয়াছিলেন। শুধু বল কেন, সোমরস ব্যাধি দূর করিত। অধিক কি বলিব, বেদের ভাষায় সোম অমরতা দিত। দেবতারা সোম পান করিয়াই অমর হইয়াছিলেন; ঋষিরাও অমরত্ব পাইবার জন্য সোম পান করিতেন। অমরতা দিতে পারে বলিয়াই সোম যজ্ঞের মাহাত্ম্য। সোমের নামান্তরই এই জন্য অমৃত। এই যে সোম, মর্ত্ত্যে তিনি ওষধির রাজা; স্বর্গে তিনি দেবগণেরও একজন রাজা; ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখিবেন, সোমকে ভূয়োভূয়ঃ রাজা সোম বলা হইয়াছে। রাজা সোম যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলে উঁহার সম্মানার্থ আথিত্য ইষ্টি যাগের বিধি। এককালে দেবগণের নিকটেও ইনি দুর্লভ ছিলেন। দেবতারা ইঁহার জন্য লালায়িত ছিলেন; ইঁহার সন্ধান পাইয়া কৌশল আশ্রয়ে ইঁহাকে আনিয়াছিলেন। সোম আনয়নের আখ্যায়িকাতে বৈদিক সাহিত্য পূর্ণ। স্বর্গের কোন উচ্চ দেশে সোম গুপ্ত ছিলেন; সুপর্ণ বা শ্যেন পাখী সেখান হইতে দেবতাগণের জন্য, ইন্দ্রের জন্য, সোম আহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় বহু স্থলে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিবেন। পুরাণে ইহা গরুড় কর্ত্তৃক অমৃতহরণের আখ্যানে পরিণত হইয়াছে। বেদে দেখিবেন, সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; পুরাণেতিহাসে দেখিবেন, সোম বা অমৃত উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মন্থন আবশ্যক হইয়াছিল—দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই অমৃতপ্রার্থী হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে নানা নিধি উঠিয়াছিল; সর্ব্বশেষে উঠিয়াছিলেন সোম বা অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অমৃত লাভ করেন; কেবল মহাদেবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সর্ব্বত্র এই আখ্যায়িকা নানারূপে দেখিবেন। সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট লুক্কায়িত ছিলেন; কোন পাখী, শ্যেনী

বা সুপর্ণী সেই সোম আনয়ন করে; সেই সুপর্ণী আর কেহ নহে, স্বয়ং গায়ত্রী। আবার দেখিবেন, গন্ধর্ব্বদের নিকট সোম ছিলেন; দেবতারা বাগ্‌দেবীকে সেই সোম আনিবার জন্য পাঠাইতেছেন; স্ত্রীপ্রিয় গন্ধর্ব্বেরা নগ্না কুমারী বাগ্‌দেবীর লোভে সোম ছাড়িয়া দিল; বাগ্‌দেবী সোম লইয়া চলিয়া আসিলেন। সোম যজ্ঞের আরম্ভে সোমক্রয় উপলক্ষে এই ঘটনার অভিনয় হইত, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই বাগ্‌দেবী এবং গায়ত্রী অভিন্ন; কেন না গায়ত্রী ছন্দোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। বেদের মন্ত্রই বাক্; এবং বেদের সারভূতা গায়ত্রী মন্ত্র বেদের শ্রেষ্ঠ বাক্য; গায়ত্রীই বাগ্‌দেবতা। স্বয়ং বাগ্‌দেবতাকে সোম আনয়ন করিতে হইয়াছিল—তিনি সোম আনিয়া দেবগণকে অমৃতত্ব দান করিয়াছিলেন। দেবতারা সোম যাগ করিতেন; স্বয়ং প্রজাপতি সোম যাগ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্‌ত্য দেবগণের পানের জন্য সোম রস প্রস্তুত করিতেন। আবেস্তা শাস্ত্রেও সোমের এই সমুদয় মাহাত্ম্য, এই সমুদয় আখ্যায়িকা, কোনও না কোনও আকারে পাওয়া যায়; আবেস্তা শাস্ত্রেও বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্‌ত্যের নাম প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের মধ্যেও উপাখ্যান আছে, দেবরাজ Zeusএর জন্য ঈগ্‌ল পক্ষী মধু আনিয়াছিল; জর্ম্মাণদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল, দেবরাজ Odhin ঈগল রূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই ঈগ্‌ল পক্ষী শ্যেন বা সুপর্ণ; এই মধুই সোম। এই সোম কেবল বেদপন্থীর প্রধান দেবতা নহেন; সমস্ত আর্য্য জাতিরই অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা। সোম যজ্ঞ আর্য্য জাতিরই প্রচীনতম জাতীয় অনুষ্ঠান। সর্ব্বত্র ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কয়েকজন পার্সী ঔপনিবেশিক এখনও এই প্রাচীন অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই।

এই সোম দেবতাটী কে? আপনারা সোমলতা কখনও চোখে দেখেন নাই। সোম শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে আপনারা বলিবেন, সোমের

অর্থ চন্দ্র। ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে সোমকে চন্দ্রই বলা হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সোম আর চন্দ্র অভিন্ন। ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্র মধ্যেও কয়েক স্থলে সোম অর্থে যে চন্দ্র তাহা মনে করিতেই হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত আছে; সূর্য্যকন্যা সূর্য্যাকে তাহার ঋষি বলা হইয়াছে। ঐ সূক্ত মধ্যে সূর্য্যারই বিবাহের বর্ণনা রহিয়াছে। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাষায় ঐ সূক্তের আরম্ভ হইয়াছে। "পৃথিবী সত্য দ্বারা উত্তম্ভিত রহিয়াছে, দ্যুলোক সূর্য্যদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আদিত্যগণ ঋতকে আশ্রয় করিয়া দ্যুলোকে রহিয়াছেন; সোমও ঋতের আশ্রয়ে ধৃত রহিয়াছেন। সোমের বলেই আদিত্যগণ বলীয়ান, সোমের বলেই পৃথিবী মহীয়সী। অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ—নক্ষত্রগণের সন্নিধানেই সোম অবস্থিত রহিয়াছেন।" নক্ষত্রগণের নিকটে যে সোম, সে সোমকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। লতা সোমকে সেই চন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তিও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋষি পরক্ষণেই সাবধান হইয়া বলিতেছেন, "সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্তি ওষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পেষণ করিয়া লোকে মনে করে যে সোম পান করিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে সোমের নিগূঢ় তথ্য জানেন, সে সোমকে কেহই পান করিতে পায় না। পুনরায় জোরের সহিত বলা হইতেছে, "ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ"—পৃথিবীর কেহই সোমকে পান করিতে পায় না। আবার বলা হইয়াছে, "যৎ ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ"—দেব সোম, তোমাকে যে পান করা যায়, তাহাতে তোমার ক্ষয় হয় না, তোমার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই সোম দেবতা কোন্ দেবতা?

ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মত। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এখনও এই হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মান পণ্ডিত হিলিব্রান্ত জোরের সহিত বলেন, চন্দ্রই আর্য্য জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন, চন্দ্রই

সোম ; ঋক্ সংহিতায়ও সর্ব্বত্র সোম-অর্থে চন্দ্র। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্ সংহিতায় সোম সোমলতা মাত্র ; ক্রমশঃ তাহাতে চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে ; ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রচারের সময় তিনি একবারে চন্দ্র হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে যখন বিতণ্ডা, তখন আমাদের মত মূর্খের নিরস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু চন্দ্রের সহিত পার্থিব সোমলতায় এই সম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হইল, মানব বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রশ্ন এই যে, চন্দ্রের ও সোমলতার সাদৃশ্য কোথায়? নিতান্ত আন্দাজের উপর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে উল্লেখ আছে যে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সূর্য্যের তেজের কতকটা চন্দ্রে প্রবেশ করে ; কতকটা ওষধি মধ্যে প্রবেশ করে ; তাই রাত্রিকালে চন্দ্র উজ্জ্বল হন, কোন কোন ওষধিও উজ্জ্বল হয়। কোন কোন ওষধি—বন্য লতা বা বন্য উদ্ভিদ্ রাত্রিতে উজ্জ্বল হয় ; অর্থাৎ—phosphoresce করে। কথাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। বস্তুতই চাঁদের আলো এবং বুনো লতার phosphorescence সূর্য্য রশ্মিরই পরিণতি মাত্র। হিমালয় পর্ব্বতে এইরূপ phosphorescent ওষধি আছে, কালিদাসের সময় হইতে কবিগণ তাহা বলিয়া আসিতেছেন। পার্ব্বত্য লতাগুল্মের এই দীপ্তি কালিদাসের কবিচিত্তে বেশ একটা ধাক্কা দিয়াছিল। কুমারসম্ভবের আরম্ভেই "ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যাম্ অতৈলপূরাঃ সুরত প্রদীপাঃ" এই শ্লোকটি স্মরণ করিবেন। ওষধিপতি সোমলতা এ পর্য্যন্ত কেহ identify করিতে পারেন নাই ; কিন্তু খুব সম্ভব ইহা রাত্রিকালে phosphoresce করিত। লোকে দেখিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ থাকে, সন্ধ্যার পর আঁধার ঘনীভূত হইলে আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠে ; একের সঙ্গে যেন অন্যের সম্পর্ক বাঁধা আছে। আকাশের চাঁদ ক্রমে ক্ষয় পায়, অমাবস্যার দিন যেন একবারে লুপ্ত হয় ; কিন্তু দুদিন পরে আবার ক্ষীণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমার দিনে পূর্ণ চাঁদ আকাশ আলো করে। এই

চাঁদ কোথায় যায়? দেবগণ ইহাকে পান করেন, তাহাতেই ইহা ক্রমে ক্ষয় পায়। কিন্তু ইহা একবারে ক্ষীণ হইবার বস্তু নহে; ইহা আবার বৃদ্ধি পায়, ইহার আপ্যায়ন ঘটে। বস্তুতঃ ইহা লুপ্ত হইবার নহে; ইহা অমৃত-স্বরূপ। সোমলতা ওষধি, অর্থাৎ বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। বৎসর মধ্যে জন্মে, বাড়ে, মরে, আবার পর বৎসর যথাকালে গজাইয়া উঠে; আরণ্য উদ্ভিদ্, কেহ রোপণ করে না, কেহ যত্ন করে না, অথচ মরিয়াও যেন মরে না। আকাশের চাঁদ যেমন লুপ্ত হইয়াও লোপ পায় না; পৃথিবীর লতাও তেমনি মরিয়াও মরে না। উভয়েই স্বরূপতঃ এক; উভয়েই অমৃতস্বরূপ। আকাশে যে গ্রহপতি, পৃথিবীতে তাহা ওষধিপতি। উভয়ই স্বরূপতঃ এক; উভয়েই সোম। আকাশের নক্ষত্রগুলি দেবতাদের গৃহ; দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি। দেবতারা আপন আপন ঘরে বসিয়া থাকেন; সোম সেই ঘরে ঘরে বিচরণ করে; দেবতারা তাহা পান করেন; পানের পর সোম-পাত্র রিক্তপ্রায় হইলে সোমের আবার আপ্যায়ন হয় বা পূরণ হয়। আকাশে নক্ষত্রমধ্যে বিচরণ কালে ছোট ছোট গ্রহগুলিও—planet গুলিও—হয়ত ছোট ছোট সোমপাত্র; ঐ পাত্রও অমৃতপূর্ণ; দেবতারা ঐ গ্রহ পূর্ণ করিয়া সোম পান করেন। পৃথিবীতে ওষধি সোম দ্যুলোকে স্থিত সেই সোমেরই প্রতিরূপ। যজমান ও ঋত্বিকেরা পাত্র পূর্ণ করিয়া সোমরসের গ্রহ পান করেন। সেই সোমও ফুরায় না; সেই জন্য তাহার আপ্যায়ন অনুষ্ঠান।

এই যে সোম দেবতা, তিনি মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্রই ছিলেন, অথবা পার্ব্বত্য লতামাত্র ছিলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। বেদপন্থী যাজ্ঞিকের এবং যজমানের সে বিচারে বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টাইলারের স্বীকারোক্তি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper

performs it. কোন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, যজমানের পক্ষে ও যাজ্ঞিকের পক্ষে ঐ intentionটাই বড় কথা এবং একমাত্র কথা। সোম দেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁহাকে কোন্ চোখে কিরূপে দেখিতেন, তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্ত্যঃ" ; ইহাঁরা স্তুতি-গানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ইহার প্রশংসার্থ মন্ত্র পাঠ করিতেন, ঋগ্‌মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সাম মন্ত্রে ইহার স্তুতি গান করিতেন। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটাই ইহাঁর স্তুতি-গীতে পরিপূর্ণ—ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইহাঁর প্রশংসাবাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইহাঁর গুণ গান করিতেছেন ; বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্ত্য দেব, এই চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব্ব, আকাশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত ছিলেন ; সেখান হইতে জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; ইহাঁর শুভ্র তেজ দীপ্তি পাইতেছিল ; দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। ইনি স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূলোককে দ্যুলোকের সহিত যুক্ত করিয়াছেন ; তিনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন। এই নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান্, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান্, ইনি জগতের আয়ুঃস্বরূপ। দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন বলিতেছেন, ইনি দেবগণ-মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণমধ্যে ঋষি, মৃগগণমধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণমধ্যে শ্যেন পক্ষী। ইনি "ঋতস্য গোপা"—সত্যের রক্ষাকর্ত্তা। ইনি বিদ্বান্ ; ঊর্দ্ধ হইতে, ইনি বিশ্বভবনে দৃষ্টি করেন। "ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্রে, আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া"—ইহাঁরই মায়াবলে বরুণদেবের জিহ্বাগ্রে সত্য-ধর্ম্মের তন্তুসূত্র পবিত্রোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে। ঋষি কশ্যপের সহিত আমরাও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্ন
সত্যং বদন্ সত্যকর্ম্মন্
শ্রদ্ধাং বদন্ সোমরাজন্
ধাত্রা সোম পরিষ্কৃতঃ।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

হে ঋতদ্যুম্ন, তুমি ঋত বাক্য বলিয়া থাক; হে সত্যকর্ম্মা, তুমি সত্য বাক্য বলিয়া থাক; হে সোম রাজা, তুমি শ্রদ্ধাবাক্য বলিয়া থাক; ধাতা কর্তৃক পরিষ্কৃত হইয়া ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ
সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ,
সং যন্তি রসিনো রসাঃ
পুনানো ব্রহ্মণা হরে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

সত্য তুমি উগ্র; তুমি বৃহৎ; তুমি রসস্বরূপ; তোমার রসধারা সর্ব্বত্র মিলিত হইতেছে; অহে হরি, ব্রহ্মবাক্যে পূত হইয়া তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যত্রানুক্ষামং চরণং
ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ,
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

উর্দ্ধস্থিত সেই তৃতীয় নাকে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে, যেখানে যথাকাম মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতিষ্মান্, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র রাজা বৈবস্বতো
যত্রাবরোধনং দিবঃ,
যত্রামূর্য্যহ্বতীরাপঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

যেখানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেখানে দ্যুলোকের অবরোধ দ্বার, যেখানে অপসমূহ প্রবহমান, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র জ্যোতিরজস্রং
যস্মিন্ লোকে স্বৰ্হিতম্,
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান
অমৃতে লোকে অক্ষিতে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

যেখানে অজস্র জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত, হে পবমান সোম, সেই অক্ষয় অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

## খ্রীষ্ট-যজ্ঞ।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়, খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা বিদ্রূপ প্রচলিত আছে।

এই দেবতা খাওয়ার কথা আমি তুলিয়াছি। Eucharistic Sacrifice উপলক্ষে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয়, উহা খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত— উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়। এতদ্দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়। খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট হইয়া যায়; মানুষ দেবতা

হইয়া যায়। আপনারা হাসিবেন ও বলিবেন, একাত্মতা-সম্পাদনের এমন সহজ উপায় আর নাই; চিবাইয়া আত্মসাৎ করার মত একাত্মতা পাইবার উপায় আর নাই।

হাসিলে চলিবে না; মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা দেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের এই উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নহে। দেবতাকে আত্মস্থ করিবার এমনই একটা উপায় বহু দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক জন মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed."

আপনারা এই totemএর কথা শুনিয়াছেন। বহু অসভ্য জাতি আপনাকে কোন না কোন জন্তুর বংশধর বলিয়া মনে করে। সেই জন্তুকে আপনার জ্ঞাতি মনে করে; তাহার পূজা করে, এমন কি আচারে ব্যবহারে সেই জন্তুর অনুকরণ করে। সেই জন্তুটার নাম টোটেম; জন্তু না হইয়া গাছপালা বা অন্য কিছু টোটেম হইতে পারে। পুরাণে বর্ণিত নাগ জাতির, পক্ষিজাতির কথা আপনাদের মনে পড়িবে; বাসুকি, তক্ষক ইত্যাদি নাগের কথা মনে পড়িবে; সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি পাখীর কথা মনে পড়িবে; বালী, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরের,

জাম্ববান্ প্রভৃতি ভালুকের কথা মনে পড়িবে। বংশপ্রতিষ্ঠা যে পশু হইতে, বংশধরগণের পূজা পাওয়া সেই পশুর পক্ষে সহজ; পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপে বহু স্থলে পশু দেবতা হইয়া গিয়াছে। পশু এইরূপে দেবত্ব পায়, আবার অন্য দিকে মানুষ ও দেবতা জ্ঞাতি-সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া যায়। ঐ পণ্ডিত বলিতেছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান একটা sacramental meal মাত্র; যজ্ঞের পর যাবতীয় লোকে যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাতে তাহারা দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। পশুবধটা যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান নহে; সকলে মিলিয়া পশুমাংস ভক্ষণটাই প্রধান অনুষ্ঠান—"The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentally confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers."

যজ্ঞানুষ্ঠান-সম্বন্ধে এ কালের পণ্ডিতদের এই একটা থিয়োরি—এই থিয়োরির সমর্থনের জন্য বহু দেশ হইতে তাঁহারা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন; চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছেন। মতভেদেরও অন্ত নাই। এই টোটেম সম্বন্ধেই কোন পণ্ডিত বলেন, অসভ্য জাতি মাত্রেই টোটেম মানে; এ কালে যাহারা খুব সভ্য, তাহাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষেরাও এক কালে টোটেম মানিত। অন্য পণ্ডিতে টোটেমের প্রসর সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার বলিতেছেন,—"We may say broadly that totemism is practised by many savage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark

brown to red. With the somewhat doubtful exception of a few Mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic." অর্থাৎ কালা, পিঙ্লা ও রাঙা মানুষে টোটেম মানে, ধলা ও হল্‌দে মানুষে মানে না। টোটেমের কথা এখন থাক; দেবতা খাওয়ার দৃষ্টান্ত দুই একটা আলোচনা করিব।

মেক্সিকোতে এককালে নরযজ্ঞ হইত। উহাদের প্রাচীন দেবতাদের নাম উচ্চারণ ভীষণ ব্যাপার। তাহাদের একটি দেবতার নাম ছিল—তেজকাৎলি পোকাস বা ঐরূপ একটা কিছু। বড় লোকের ছেলে ধরিয়া সেই দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইত। কিছুকাল ধরিয়া বেচারাকে দেবতা বলিয়া মান্য করা হইত; সে একাধারে মানুষ ও দেবতা হইত; অবশেষে তাহাকে বধ করিয়া তার মাংস সকলে বাঁটিয়া খাইত। মেক্সিকোতে হুইজি-পুজলি নামে আর একটি দেবতা ছিল; তাহার ময়দার মূর্ত্তি গড়িয়া সকলে খাইত; মনে করিত, দেবতার মাংস খাওয়া হইতেছে। মিশর দেশের প্রধান দেবতা অসিরিসের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। পশু মধ্যে বৃষ অসিরিসের পার্থিব মূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইত। আমাদের গাভী যেমন ভগবতী, মিশর দেশের বৃষ সেইরূপ ভগবান্ ছিলেন। তবে মিশর দেশে এই দেবতাটিকে বধ করিয়া তাহার মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। Encyclopædia of Religion and Ethics এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on the God." গ্রীকদের মধ্যে, রোমানদের মধ্যে এইরূপ দেবতা খাওয়া প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটিয়াছে। বাদানুবাদের হেতু আছে—কেন না গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা জোরের সহিত বলিতে চাহেন যে, এই দেবতা খাওয়া ব্যাপারটা আমাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান; আর কোন ধর্ম্মে দেবতা খাওয়া নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহা

মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, উহা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। কাজেই দুই দলে গণ্ডগোল বাধিয়া যায়; সেই গণ্ডগোলের অন্ত হয় না। দেবতার উদ্দেশে পশুবধ, এবং সেই পশুর মাংস ভক্ষণ বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেই পশুটা দেবতা কি না, সেই পশুর মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন কি না, উহার মধ্যে দেবতার real presence আছে কি না, সেই পশু খাইলে দেবতাকে খাওয়া হয় কি না, দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া দেবতার সহিত একতাপ্রাপ্তি ঘটে কি না, ইহা লইয়াই তর্ক উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলিতে চাহেন, এইরূপে দেবত্বলাভের প্রার্থনা করি, কেবল আমরা। অন্যে কেবল পশুমাংস খায়—উদরপূরণের জন্য; বড় জোর দেবতার প্রাসাদ পাইয়া নিজের উদরপূরণের ব্যবস্থা করে মাত্র। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটা গূঢ় রহস্য, একটা mystery; অন্য জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ইহার অনুরূপ কিছু থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরা বলিবেন, উহা শয়তানের কারসাজি।

আজি কালি Mithraism লইয়া খুব আলোচনা হইতেছে। এই মিথ্র দেবতা প্রাচীন পারসীদিগের খুব প্রাচীন দেবতা; বেদপন্থীদের প্রাচীন দেবতা মিত্রের সহিত ইনি অভিন্ন। বেদে যিনি মিত্র, আবেস্তা শাস্ত্রে তিনিই মিথ্র। আমি ইঁহাকে মিত্রই বলিব। বেদে ইনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম; ঋগ্বেদ সংহিতায় ইঁহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই বরুণ দেবতার চিরসহচররূপে দেখিতে পাওয়া যায়;—মিত্র এবং বরুণ যেন এক জোড়া দেবতা। ভট্টিকাব্যের "ইতঃ স্ম মিত্রাবরণৌ কিমেতৌ" এই শ্লোকটি মনে করুন। বনবাসী রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া লোকে বলাবলি করিত, এ কি মিত্র এবং বরুণ কি স্বর্গ হইতে নামিয়া বনে বেড়াইতেছেন? সোমযজ্ঞের প্রাতঃসবনে একটা সোমাহুতি মিত্র ও বরুণ এই জোড়া দেবতাকেই দেওয়া হইত, এ কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহারা মাদকপ্রিয় ছিলেন না; মাদকতা-নাশের জন্য তাঁহাদের সোমরসে

দধি মিশাইতে হইত। আমরা বরুণকে বরং স্মরণে রাখিয়াছি; তিনি এখন জলাধিপতি ও পশ্চিম দিকের অধিপতি; কিন্তু মিত্রকে আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে মিত্র এবং বরুণের স্থান আরও উচ্চে—বরুণ স্বয়ং অহুর মজদ্—অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; মিত্র তাঁহার সহচর, মর্য্যাদায় প্রায় বরুণের সমান। মিত্রদেবের মর্য্যাদা পারসী সমাজে ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি বরুণদেবের পুত্র ও চিরসহচর;—পতিত মানবের প্রতি তিনি করুণাময়—মিত্র নামেই তাঁহার পরিচয়;—তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা—Saviour, Redeemer. এবং Mediator হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের সহিত মিত্রদেবতার আপনারা তুলনা করিবেন।

এই মিত্র দেবতার পূজা পারসী সমাজের সীমা ছাড়াইয়া রোম সাম্রাজ্য মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ কাল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের অধ্যাপক Groten, Christian Eucharist সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিত্রপূজার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then westward through Gaul across the Channel into the land of the Britons. It followed the Roman army and through the missionary zeal of Roman officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led some modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism. লেখক খ্রীষ্টীয় Divinity শাস্ত্রের অধ্যাপক; তিনি বলিতেছেন "mistakenly"; কিন্তু অনেক পণ্ডিতে

জোরের সহিত বলিতে চাহেন, যে রোম সাম্রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্ট পূজার তুলনায় মিত্রপূজার প্রসর প্রতিপত্তি অধিক ছিল; সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনও প্রথমে মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন; পরে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটেরা আইনের জোরে, গায়ের জোরে, মিত্রপূজা বন্ধ করিয়া দেন। মিত্রপূজা বন্ধ করিয়া দেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মিত্র-পূজার বহু অনুষ্ঠান, বহু তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; নতুবা জনসাধারণ মিত্রকে ছাড়িয়া খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিত না।

এই মিত্রপূজায় খৃষ্টানদের eucharistic অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে ঋত্বিকেরা রুটি ও সোমরস উৎসর্গ করিতেন। মিত্রপূজার প্রতিপত্তির সময়ে সোমরস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার বদলে আঙ্গুরের রস জলে মিশাইয়া দেওয়া হইত। এই দ্রাক্ষারসই ফেনাইলে মদ হয়। "They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion."

মিত্রপূজায় এই খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান দেখিয়া সেকালের খ্রীষ্টান ফাদারেরা চটিয়া আগুন হইতেন। তাঁহাদের দুই এক জনের কথা শুনুন। জষ্টিন মার্টার বলিতেছেন, "The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras, commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated." টার্টুলিয়ান বলিতেছেন, "The devil, by the mysteries of his idol,

imitates even the main parts of the divine mysteries. Mithra even celebrates the oblation of bread."

যীশুখ্রীষ্ট কথায় কথায় আপনার রক্তমাংসকে খাদ্যের সহিত, অন্নের সহিত, তুলনা করিতেন; এবং সেই অন্ন যে অমৃতস্বরূপ, তাহাও ঘুরাইয়া বলিতেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অন্নব্রহ্মের কথা আপনাদের স্মরণে আসিবে। খ্রীষ্টের উক্তি—I am the bread of life—আমি প্রাণের অন্নস্বরূপ। He that eateth my flash and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him—যে আমার মাংস ভক্ষণ করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাতে অবস্থিত হই—উভয়ের একতা সম্পাদিত হয়। Except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.—যে এই মানব-সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে নাই বা রক্ত পান করে নাই, সে মৃত। খ্রীষ্ট এখানে আপনাকে মানবরূপী,—জীবরূপী—বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পুনশ্চ "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life."—যে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, আমার রক্ত পান করিয়াছে, সে অমরতা পাইয়াছে।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। খ্রীষ্টানেরা যে রুটি আর মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা খ্রীষ্টের মাংস আর রক্ত; উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়; খ্রীষ্ট তাঁহাদের দেবতা; জনকেশ্বরে আর তনয়েশ্বরে কোন ভেদ নাই; উভয়েই এক আত্মা। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, ইহা আমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান; অন্য কোন সমাজে যদি উহার অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাকে, তহা শয়তানের কারসাজি—diabolical parody. প্রশ্ন উঠে, আমাদের বেদপন্থী সমাজে ঐরূপ অনুষ্ঠান ছিল কি না? আবেস্তাপন্থী সমাজে নিশ্চয় ছিল; বেদপন্থী সমাজে ছিল কি না?

এই আলোচনার পূর্ব্বে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। আপনারা মনে করিবেন না, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজের মধ্যেও ছিল, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া আমি বৈদিক ধর্ম্মের মহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি; ইহাতে আমাদেরও গৌরব বাড়িবে। সেরূপ দুরভিসন্ধি আমার কিছুই নাই। তবে আমি এখানে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান আমি কর্ত্তব্য-বোধ করিতেছি। সেটা না দেখাইলে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। সেই সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ঘটিল, আপনারা তাহার বিচার করিবেন। আমি এই সাদৃশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত, আর সোমরস দেওয়া হইত। রুটিটা পশুমাংসেরই বদলে দেওয়া হইত; সেই পশুমাংসে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে। রক্ত দেওয়া বেদপন্থীর পক্ষে নিষিদ্ধ; কেন না বেদ-পন্থীর দেবতা রক্ত খাইতেন না; রক্ত রাক্ষসের প্রিয়। খ্রীষ্টের রক্ত অমরত্ব দিতে পারে; কিন্তু আমাদের সোমরস রক্ত নহে; উহা একবারে অমৃত। উহা পান করিলে অমর হওয়া যায়—দেবত্ব পাওয়া যায়। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি বলিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমি সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি, আমি জ্যোতি লাভ করিয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি। এই পুরোডাশ আর সোমরস দেবতাকে দিতে হইত, আর ঋত্বিকেরা যজমান সহিত ইহা ভক্ষণ করিতেন। সোমরস পান ত অমৃত পান; পুরোডাশ-ভক্ষণের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এবং খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যের সহিত ইহার কোন মিল আছে কি না, তাহাও বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানটার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক।

খ্রীষ্টজন্মের পর শওয়া তিন শ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যে খ্রীষ্ট পূজা ছাড়িয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এখনও মিত্র পূজাকে ঠেলিয়া উঠিতে পারে নাই। খ্রীষ্টানেরা সমস্ত সাম্রাজ্যকে কতকগুলি এলাকায় ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; এক এক এলাকা এক এক বিশপের অধীন। রোমের সম্রাট্ কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন এতদিন 'সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান' ছিলেন; তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় মিত্রকে, অন্য পাল্লায় খ্রীষ্টকে বসাইয়া তুলনা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। খ্রীষ্টপূজা রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে তর্ক উঠিয়াছে, এই খ্রীষ্টটি কে? ঈশ্বরের সহিত ইহাঁর সম্পর্ক কি? ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটে, কিন্তু পিতা পুত্রে সমান কি না? উভয়ে তুল্যমূল্য কি না? পুত্র ষোল আনা ঈশ্বর কি না? ষোল আনা ঈশ্বর হইলে একেশ্বরবাদ থাকে কোথায়? খ্রীষ্টীয় সমাজে ইহা লইয়া দলাদলি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কাইসার কন্‌ষ্টাণ্টাইন নাইসিয়া নগরে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিলেন—বহু পূর্ব্বে অশোক যেমন বৌদ্ধ সঙ্গীতি ডাকিয়া-ছিলেন সেইরূপ। নানা দেশ হইতে খ্রীষ্টান যাজকেরা আসিলেন; হাজার দুই যাজক আসিলেন, তার মধ্যে তিন শতাধিক বিশপ। রাজ-প্রাসাদের বড় হলে তাঁহারা সারি দিয়া বসিলেন; হলের মাঝখানে উচ্চাসনে বাইবেল রক্ষিত হইল—রত্নখচিত purple robe পরিয়া স্বয়ং কাইসার সিংহাসনে বসিলেন;—আজি তিনি রোমের রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ—pontifex maximus. যাজকগণের ভোট লইয়া তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব মঞ্জুর করিবেন। এক দিকে Ariusএর দল; ইহাঁরা খ্রীষ্টকে ষোল আনা ঈশ্বর বলিতে নারাজ; অন্য দিকে Athanasius এর দল; ইহাদের মতে খ্রীষ্ট ষোল আনা ঈশ্বর। আথানেসিয়সের জয় হইল। উপস্থিত যাজকগণের কোলাহলে এরায়সের দলের ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া গেল। রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা অনুমোদন

করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কাইসারের আদেশ রোমসাম্রাজ্যে প্রচারিত হইল—রোমের কাইসার মানিয়া লইয়াছেন, খ্রীষ্ট পরিপূর্ণ ঈশ্বর; যে রোমান ইহা মানিবে না, সে রাষ্ট্রের শত্রু। এরায়সের রচিত পুঁথিপত্র চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়ান হইল; তাঁহার দলের যে দুই জন বিশপ স্বীকারপত্রে সহী দেন নাই, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত জন কয়েক ইউনিটেরিয়ান ছাড়া সমস্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। যে ইহাতে সংশয় করে, সে খ্রীষ্টান নহে।

নাইসিয়া নগরে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় সমাজের এই স্বীকারোক্তির নাম Nicene Creed; সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহা মানিয়া থাকেন। আপনারা জানেন, ইংরেজেরা রোমের বিশপের এলাকার বাহিরে; ইহাঁরা পোপের অধীনতা কাটিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের আমলে Church of England এর ধর্ম্ম সম্পর্কে মতামত বাঁধা যায়। ৩৯টি ধারায় তাহা বিধিবদ্ধ। উহাই ইংরেজের চার্চের বিখ্যাত Thirty-nine Articles। বিশপেরা এই ধারাগুলি সঙ্কলন করেন; এবং রাণী এলিজাবেথ পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হইলে উহা অনুমোদন করেন। মনে রাখিবেন, ইংরেজদের রাজাও ইংরেজের দেশে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত—Defender of the Faith; তবে ইংরেজদের রাজা প্রজাপ্রতিনিধিদের সম্মতি না লইয়া কিছু করিতে পারেন না। তাই এই ধারাগুলি পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া দরকার হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টে ভোটের দ্বারা জনকেশ্বরের সহিত তনয়েশ্বরের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, এবং আজি পর্য্যন্ত সেই সম্পর্ক বাহাল আছে।

Nicene Creed স্বীকার করিতেছেন—We believe in one God, the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the word

of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only begotten Son, begotten not made, of the same essence with the Father, the firstborn of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.

Church of England মানিয়া লইতেছেন—There is but one living and true God, everlasting, without body, parts or passions, of infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible ; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance, power and eternity, the Father, the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the Godhead and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, whereof one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.

আপনারা দেখিলেন, ইংলিশ চর্চ্চ অনেকগুলি বিশেষণ স্পষ্টভাবে দিয়াছেন, যাহা Nicene creedএ নাই, অস্পষ্টভাবে আছে। Nicene creed প্রচারিত হইবার পর উহা আরও পল্লবিত হইয়াছিল ; এইরূপ পল্লবিত আর একটা creedএর নাম Athanasian Creed ; Church

of England এই creedটিও মানিয়া লইয়াছেন ; কাজেই উহা এতটা স্পষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক বিশেষণের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অখ্রীষ্টানের পক্ষে সেই তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। আমি যথাশক্তি আমাদের ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিব। ইংলিশ চর্চ্চ বলিতেছেন, There is but one God—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; তিনিই God the Father—যো নঃ পিতা জনিতা ;—তিনি living God—তিনি প্রাণ· স্বরূপ, স উ প্রাণস্য প্রাণঃ ; তিনি everlasting—অজ বা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ; without body—অমূর্ত্ত বা মূর্ত্তিরহিত ;—without parts, কলাহীন বা নিষ্কল, নিরবয়ব, অখণ্ড ; without passions—শুদ্ধ শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। এই বিশেষণগুলি একত্র করিলে আমাদের ভাষাতে পাওয়া যায়—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সো বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ—এই বাক্যের প্রায় সকল বিশেষণই খ্রীষ্টানের ভাষায় আছে। নিষ্ক্রিয় বিশেষণটা নাই। খ্রীষ্টানের ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে। দিব্য বা জ্যোতির্ম্ময় বিশেষণটাও এখানে নাই, কিন্তু Nicene Creed মধ্যে আছে। বাহ্যাভ্যন্তরঃ বা সর্ব্বব্যাপী—এটাও নাই। খ্রীষ্টান ইহাতে আপত্তি করিবেন কি না জানি না। তাহার পর বলিতেছেন "of infinite power"—সর্ব্বশক্তি ; "of infinite wisdom"—সর্ব্বজ্ঞ—এই দুইটি বিশেষণ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপরিচিত। তার পরের বিশেষণ—of infinite goodness—এখানে goodnessএর অর্থ kindness—it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures—ইহার নামান্তর Grace, কৃপা বা করুণা। অদ্বয়বাদী তাঁহার পরব্রহ্মে এই বিশেষণ অর্পণে কুণ্ঠিত হইতে পারেন ; কিন্তু রামানুজ স্বামী তাঁহার ব্রহ্মে, তাঁহার বাসুদেবে, অকুতোভয়ে এই বিশেষণ আরোপ করিয়াছেন—"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো-

হসৌ” “জগতামুপকারায় চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য” ; তিনি “অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-মহৌষধি।” তৎপরে বলা হইতেছে, তিনি maker and preserver of all things, visible and invisible তিনি যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থিতিবিধাতা ; অর্থাৎ তিনি ভূতযোনি—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।

জনকেশ্বরের বিশেষণগুলি আপনারা শুনিলেন। ঈশ্বরের সহিত খ্রীষ্টের সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য খ্রীষ্টান সমাজে অনেক গণ্ডগোল হইয়াছে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব পূর্ণ না আংশিক, ইহা লইয়াই বিরোধ। Nicene Creed যে সম্পর্ক চিরকালের জন্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বিখ্যাত Trinity তত্ত্ব, বা ত্রিপুরুষ তত্ত্ব। প্রথম পুরুষ জনকেশ্বর, দ্বিতীয় পুরুষ তনয়েশ্বর, তৃতীয় পুরুষ Holy Spirit. Trinity-তত্ত্বমতে ঈশ্বর এক হইয়াও এই তিন পুরুষ রূপে বিদ্যমান ; ইঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ ঈশ্বর, অথচ ঈশ্বর তিনজন নহেন, একজন। “The three Persons are of the same essence, power and eternity. Each is God ; in each dwells the whole fullness of the godhead. প্রত্যেকেই নিত্য, প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তিমান্। এইখানে একদল বলিতেন, পুত্র পিতার সমান ; আর একদল বলিতেন, পুত্র পিতার সদৃশ। একদলের মতে সম্পর্কের নাম homo ousia—সমাত্মকা, অন্য দলের মতে নাম homoi—ousia সদৃশাত্মকতা। পিতা ও পুত্র উভয়ের একই essence, substance বা বস্তু। অথচ উভয়ের মধ্যে একটা উপাধিগত ভেদ আছে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর হইতে জাত ; সকলের অগ্রে জাত ; begotten of the Father, first begotten of the Father. পিতা ঈশ্বর যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা—maker of all things ; কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি maker নহেন ; সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন ;

তিনি begetter মাত্র, জন্মদাতা মাত্র; ইহার মানে এই যে যাবতীয় ভূতের তিনি নিমিত্ত কারণ মাত্র, কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি নিমিত্ত কারণও বটে, উপাদান কারণও বটে। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, সে মাটি দিয়া ঘট গড়ে; কিন্তু পিতা পুত্রের পক্ষে নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ; তিনি আপনার উপাদান হইতেই পুত্রের জন্ম দেন।

পিতা পুত্রের জন্ম দিয়াছেন, সকলের অগ্রে জন্ম দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কবে কোন্ কালে জন্ম দিয়াছেন? খ্রীষ্টান উত্তরে বলেন, before all ages অর্থাৎ যখন কাল পর্য্যন্ত ছিল না, সেই কালে। ইহার অর্থ পুত্র পিতার মতই অনাদি ও নিত্য। পিতা যে তারিখে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সেই তারিখের হিসাব দেন, কিন্তু পুত্রের জন্মের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলে তিনি কালাতিগ, কালাতীত, beyond time; যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সেই কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন।

এইখানে পিতা পুত্রে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ। পিতা অনাদি ও নিত্য; পুত্রও অনাদি নিত্য, অথচ পুত্র পিতা হইতে জাত। পিতার যত কিছু উপাধি বা বিশেষণ, সমুদয়ই পুত্রে বিদ্যমান; একটা অতিরিক্ত বিশেষণ পুত্রে আছে;—তিনি পিতা হইতে জাত।

খ্রীষ্টের এই বিশেষণটি দেখিয়া আপনাদের হিরণ্যগর্ভকে মনে পড়িবে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—হিরণ্যগর্ভ জাত হইয়াছিলেন; অথচ তিনি সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি অগ্রজন্মা ঈশ্বর। জন্মমাত্রেই তিনি ভূত সকলের পতি হইয়াছিলেন, ভূতপতি আর প্রজাপতি যদি এক অর্থে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজাপতিও অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমাদের শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই প্রজাপতিই ভূতসকলের স্রষ্টা—তিনি কামনা করিলেন, আর ভূতসকলের ও প্রজাসকলের সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও খ্রীষ্টান

বলেন, তিনি অগ্রজন্মা পুত্র এবং তাঁহার দ্বারাই পিতা ঈশ্বর ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—through Him all things were made; খ্রীষ্টের জন্মেই সৃষ্টির আরম্ভ—His everlasting birth is the first step towards creation and the universe of things owes its origin to Him. হিরণ্যগর্ভ যেমন ভূতসকলের পতি, খ্রীষ্টানেরাও খ্রীষ্টকে সেইরূপ ভূতসকলের পতি বলিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের চলিত বিশেষণ our Lord; আর একটা বিশেষণ King,—King of Kings or Lord of Lords; far above all authority and power and every name which is named.

আপনারা দেখিলেন, পিতা ও পুত্র সর্ব্বতোভাবে ও তুল্যরূপে পরিপূর্ণ ঈশ্বর; তবে উভয়ের মধ্যে উপাধিভেদ আছে। উভয়ে অনাদি ও নিত্য হইলেও পিতা জন্মরহিত বা অজ; পুত্র পিতা হইতে জাত এবং অগ্রে জাত। এই ভেদ সত্ত্বেও অভেদ স্পষ্ট করিবার জন্য আরও কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগ হয়। পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছেন; কে কাহা হইতে জন্মিয়াছেন; উত্তরে বলা হয়, God from God—ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর জন্মিয়াছেন; very God from very God—পূর্ণ ঈশ্বর হইতে পূর্ণ ঈশ্বর জন্মিয়াছেন। অতঃপর বলা হয় Light from Light—পিতা জ্যোতিঃস্বরূপ, পুত্রও জ্যোতিঃস্বরূপ। Life from Life—পিতা প্রাণস্বরূপ, পুত্রও প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের সেই সূত্র তিনটী মনে করুন —"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" "প্রাণস্তথানুগমাৎ" "অতএব প্রাণঃ"। ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদের বাক্য অবলম্বনে এই সূত্র তিনটি। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"অথো যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু, সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু, অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু, যদিদং বাব তদ্, যদিদং অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ"—যে জ্যোতিঃ দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বের পৃষ্ঠে, সর্ব্বলোকের পৃষ্ঠে দীপ্তিমান্, পুরুষের অন্তঃশরীরে যে জ্যোতিঃ

দীপ্তিমান্, সেই পরজ্যোতিই এই জ্যোতিঃ। ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয়, কেন না, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভা দেয়, তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভান্বিত হয়। কৌষীতকি বলিতেছেন, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব"—আমি প্রাণস্বরূপ ও প্রজ্ঞাস্বরূপ, আয়ুঃস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ; আমাকে উপাসনা কর। ছান্দোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "কতমা সা দেবতা"? উত্তরে বলিতেছেন, "প্রাণ ইতি হোবাচ"—তিনি প্রাণ। এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আর হইতে পারে না।

এই খ্রীষ্টকে যেমন Son of God বলা যায়, তেমনি ইহাঁকে Son of Man বলা হয়। Nicene Creed এই son of Man সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতেছেন, Who for our salvation became flesh, and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. এইরূপে সংক্ষেপে খ্রীষ্টের মনুষ্য-জীবনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য মানববিগ্রহ ধরিয়া মানবের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং মানবের জন্য প্রাণ দিয়া তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থান করেন, ও পিতার সমীপে উপস্থিত হন। এই জন্য তাঁহাকে Saviour বলা হয়। Saviour শব্দের অনুবাদ আপনারা শুনিতে চাহেন? তারাসার উপনিষদে ইহার অনুবাদ পাইবেন—অত্যন্ত পরিচিত ভাষায় অনুবাদ পাইবেন—Saviour এর অনুবাদ তারক-ব্রহ্ম।

মানবরূপে বা জীবরূপে ঈশ্বরের অবতরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। যিনি ঈশ্বররূপে অমূর্ত্ত, জীবরূপে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেমন পরিপূর্ণ, তাঁহার জীবত্বও সেইরূপ পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের সহিত তিনি যেমন একাত্মা, জীবের সহিতও তিনি তেমনি একাত্মা। একাধারে তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। মনে করিবেন না, মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণেই তিনি

জীবত্ব পাইলেন; তিনি অনাদি জীব। মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণের নাম Incarnation বা মানববিগ্রহধারণ; কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি জীব—কেন না "He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father." তিনি মানবজন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জীবরূপে পিতার সহিত যুক্ত ছিলেন। মর্ত্ত্যভূমি হইতে তিরোভাবের পরেও তিনি এই জীবত্ব ত্যাগ করেন নাই। এইরূপে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ জীবত্ব তাঁহাতে চিরতরে মিলিত হইয়া আছে। "Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided." এই পূর্ণ ঈশ্বরত্ব এবং পূর্ণ জীবত্বের সম্মেলনে একই Christ; ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহাতে একাধারে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। কখনও তাঁহাতে বিচ্ছেদ ঘটে নাই বা ঘটিবে না।

ইতর জীবের সহিত এই খ্রীষ্টের সম্পর্ক কিরূপ? জীবমাত্রই ঈশ্বরের পুত্রস্থানীয় হইয়াও পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত; জীবের অপরাধে উভয়ের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধের খ্রীষ্টানী নাম Sin—পাপ। অধ্যাপক ডয়সেন দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টান যেখানে বলেন পাপ, বেদপন্থী সেখানে বলেন অবিদ্যা। খ্রীষ্টান বলেন, এই অপরাধে জীব তাহার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল—এমন কি ঈশ্বরের সহিত জীবের একটা শত্রুতা সম্পর্ক—enmity দাঁড়াইয়াছিল। পিতা করুণাময়—তিনি পুত্রগণকে কোলে টানিয়া লইতে চাহেন—নতুবা তাঁহার সোয়াস্তি নাই। জীবের পাপ এমন ভীষণ পাপ যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা মোচন করিতে পারে না; বেদপন্থী বলিবেন, "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পারং তারয়তি"—তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে তারণ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। খ্রীষ্টান বলিতেছেন —Man's sin was so great that God only could pay it;

therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute form of God, He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a *bondman* and appeared in the likeness of man. জীবের তারণার্থ খ্রীষ্ট স্বয়ং জীব সাজিলেন, যাবতীয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, গর্ভাবাস, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, দৈন্য :সমুদয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর ; I and my Father are one—আমার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ; তথাপি তিনি আপনার সমুদয় ঐশ্বর্য্য হইতে আপনাকে রিক্ত করিয়া ক্ষুদ্র জীব হইলেন। তিনি বড় হইয়াও ছোট হইলেন ; তিনি মুক্ত পুরুষ হইয়াও বদ্ধ জীব—bondman —সাজিলেন। এই বদ্ধ জীব বিশেষণটা আপনারা মনে রাখুন। ক্ষুদ্র জীব সাজিয়া তিনি দীন দরিদ্রের মধ্যে জন্মিলেন। তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার উপজীবিকা ছিল না ; তাঁহার স্বজনেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল ; তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন ; রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিল ; ইতর জনে তাঁহার অঙ্গে থুৎকার দিল ; তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দিল ; অপর শিষ্যেরা অন্তিমকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিল ;—অবশেষে দুই চোরের মাঝে ক্রুসে চাপিয়া মরণযাতনা ভোগ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতর মানবের মত দারুণ যাতনা ও দারুণতর অপমান সহিয়া এই যে মরণ, ইহাই হইল খ্রীষ্টের আত্মদান-রূপ মহাযজ্ঞ। তিনি পূর্ণ জীবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন ; জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমুদয় মানবের তিনি প্রতিভূ ছিলেন ; অতএব সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে তিনি আপনাকে

নরপশুরূপে এই পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিলেন। এ যজ্ঞে তিনিই পশু; মেষের মত তিনি যজ্ঞভূমিতে যথার্থ আনীত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে Lamb of God রূপে—ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট মেষরূপে—পরিচিত করিয়াছিলেন—বহু স্থলে তাঁহাকে মেষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জেহোবার উদ্দেশে মেষ দেওয়া হইত; তিনি সেই মেষপশুরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যজ্ঞিয় পশু। তিনি আপনাকে আপনি আহুতি দিয়াছিলেন—অন্য যাজকের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তিনি একাধারে ঋত্বিক্ এবং পশু,—Priest এবং Victim. সমস্ত মানব তাঁহার যজমান; তিনি তাঁহাদের ঋত্বিক্ সাজিয়া আপনাকে পশুতে পরিণত করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। এই আত্মাহুতি কাহার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন—যে পিতা-ঈশ্বরের সহিত তিনি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মৃত্যুর পরে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন; মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই; মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া তিনি তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পিতা ঈশ্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানবের সেই পুরোহিত মানব-যজমানের পক্ষ হইতে সেই আহুতি পিতার নিকট অদ্যাপি অর্পণ করিতেছেন—চিরকাল অর্পণ করিবেন। এই আহুতি দ্বারা জীবের পাপ মোচন হইল;—ঈশ্বরের ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা দূর হইল—জীব পুনরায় পিতার নিকট পুত্ররূপে গৃহীত হইল। উভয়ের মধ্যে atonement হইল; এই atonement অর্থে at-one-ment অর্থাৎ making at one. খ্রীষ্টানে বলিবেন, ইহা reconciliation; জীবেশ্বরের সন্ধিস্থাপন; বেদপন্থী বলিবেন, ইহা কেবল সন্ধিস্থাপন নহে, ইহা একাত্মতাস্থাপন। যজমান ইহাতে দেবতা হইল; জীব শিব হইল। মনে রাখিবেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই জীবের সহিত শিবের মিলন ঘটিল। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং ঈশ্বর, আহুতির দ্রব্য স্বয়ং ঈশ্বর, এবং উদ্দিষ্ট দেবতাও স্বয়ং ঈশ্বর।

প্রকৃতই ইহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্—ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হব্যকে ব্রহ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন।

বাইবেলের বর্ণনামতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; লোকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সমাধি শূন্য; কোন কোন ভক্তকে তিনি এই অবসরে সশরীরে দেখাও দিয়াছিলেন। তার পরে তিনি তিরোধান করেন—স্বর্গে আরোহণ করেন। এই ঘটনার নাম Resurrection বা পুনর্জ্জন্মলাভ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই ঘটনা টিকে না—এই ঘটনার পক্ষে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয়, কোন ঐতিহাসিক তাহাতে তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু খ্রীষ্টীয়সমাজ ইহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে—এই ঘটনাকে অমূলক বলিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হয়। এই ঘটনাতে প্রতিপন্ন হইল, যে খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয়। যে মৃত্যু জীবের পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই মৃত্যুকে তিনি জয় করিলেন; যিনি অমর, তিনি ত অমর রহিলেন; মরণ-ধর্ম্মী জীবকেও তিনি অমরতা দান করিলেন। ঈশ্বরে যে অমরতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান, ইতর জীবও তাহাতে অধিকার পাইল। এই অমরতার প্রাপ্তি খ্রীষ্টানের salvation বা মুক্তি। এতদ্দ্বারা জীব ঈশ্বরের সমীপস্থ হইল। আমাদের ভাষায় সালোক্য বা সামীপ্য লাভ ঘটিল। ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ বা একবারে ঈশ্বরত্বলাভ, খ্রীষ্টানের পক্ষে হয় ত বাঞ্ছনীয় নহে;—আমাদের দেশে ভক্তিপথের পথিকেরাও যেমন সাযুজ্য চাহেন না, কতকটা সেইরূপ। অমরতাপ্রার্থী খ্রীষ্টানেরা স্বর্গে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে চান,—একবারে সশরীরে স্বর্গে যাইতে চান। কোনরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে স্বর্গে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। মর্ত্ত্যভূমির জীর্ণবাস ত্যাগ করিয়া বিদেহ মুক্তিতে তাঁহাদের পোষায় না—তাঁহারা একবারে কলার নেকটাই সমেত সশরীরে ঈশ্বরের সালোক্য বা সামীপ্য প্রার্থনা করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথা আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকা মধ্যেও আছে—যযাতি, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র

প্রভৃতির সশরীরে স্বর্গগমন-চেষ্টার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যুধিষ্ঠির প্রায় নির্ব্বিঘ্নে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। বেদপন্থীর এই স্বর্গ কিন্তু নিকৃষ্ট লোক; ইহা ব্রহ্মলোক নহে। বেদের ভাষায় ইহা দেবগণের প্রিয় ধাম; যিনি মোক্ষার্থী, তিনি ইহা প্রার্থনা করেন না। যুধিষ্ঠির সশরীরে এই স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম পরিহার সম্ভবপর নহে। যীশুখ্রীষ্টও ক্রসে মরণের পরে এবং সমাধি হইতে উত্থানের পূর্ব্বে একবার অধোভুবনে বা নরকে গিয়াছিলেন—Athanasian Creed ইহা স্পষ্টবাক্য মানিয়া লইয়াছেন। সত্যই তিনি নরক দর্শনে গিয়াছিলেন—নতুবা তাঁহার জীবত্ব পরিপূর্ণ হইত না। ক্ষুদ্র জীবকে যাহা কিছু সহিতে হয়, ঈশ্বরও জীব সাজিয়া সে সমস্তই সহিয়াছিলেন।

খ্রীষ্ট দেবতাটি কে, এখনও তাহা বুঝিতে বাকি আছে কি? খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে খ্রীষ্টের যে সকল বিশেষণ আরোপ করা হয়, আমি যথাশক্তি তাহা এ দেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম—অনুবাদ দেখিয়া আপনারা হয়ত চমকিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিলেন। ফলে আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বলিতে চাহি, আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে জীব বলা হয়, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক। আমাদের দেশে এই সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া যেমন অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় সমাজেও সেই সম্পর্ক বুঝিতে গিয়া সেইরূপ নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ সেই বাদ প্রতিবাদের আলোড়নে কম্পিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টীয় সমাজ শেষ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা একেবারে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ না হইলেও অদ্বয়বাদকে ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। খ্রীষ্টান মানিয়া লইয়াছেন,

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি সঙ্কল্প মাত্রে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন—God said Let there be light, and there was light ইত্যাদি। বেদান্তেও 'স ঐক্ষত' 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী এই সকল আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "সঙ্কল্পেনাসৃজৎ লোকান্"—সঙ্কল্প দ্বারাই তিনি লোকসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলে বলে, He made man after his own image—আমরাও বলি, ঈশ্বরই জীব হইয়াছেন; উভয়ের সম্পর্ক বিম্ব প্রতিবিম্বের সম্পর্কের মত। Image শব্দের বাঙ্গালাই প্রতিবিম্ব। খ্রীষ্ট এক দিকে Son of God হইয়াও স্বয়ং true God, very God, perfect god বা মহেশ্বর বা পরমেশ্বর; অন্য দিকে তেমনি তিনি Son of Man হইয়াও perfect Man, sinless Man বা পুরুষোত্তম। উভয়েই অনাদি নিত্য, উভয়েই সর্ব্বেশ্বর, উভয়েরই ঈশ্বরত্ব পূর্ণ। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন পুরুষ হইলেও এবং উভয়ে সমানভাবে ঈশ্বর হইলেও ঈশ্বর এক বই দুই নহে। There is but one God, but not two Gods. খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশিয়া রহিয়াছে, খ্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলে? খ্রীষ্টীয় সমাজে নানা বাদ প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়াছি। Arius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন পুত্র, তখন তিনি পিতার পরে জন্মিয়াছেন; তিনি অনাদি নিত্য হইতে পারেন না। Apollonarius বলিলেন, খ্রীষ্ট একাকী এক জন পুরুষ; তিনি হয় পুরাপুরি ঈশ্বর, না হয় পুরাপুরি জীব; একা তিনি উভয় হইবেন কিরূপে? বৃহদারণ্যকে তিনি উত্তর পাইতে পারিতেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"; উনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ; "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" পূর্ণ হইতেই পূর্ণ বাহির হইয়া থাকে—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ। Nestorius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন ঈশ্বর, অপিচ খ্রীষ্ট যখন জীব, তখন তিনি এক জন পুরুষ নহেন; এক খ্রীষ্টের মধ্যে দুইজন

পুরুষ বিদ্যমান। Eutychius বলেন, খ্রীষ্ট এক পুরুষ; তিনি হয় ঈশ্বর, নয় জীব; একাধারে উভয় হইতে পারেন না। খ্রীষ্টীয় সমাজ পরিশেষে এ সকল মতই ত্যাগ করিল—বলিল, না, খ্রীষ্ট একই পুরুষ; তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং জীব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব—জীবেশ্বরে কোন ভেদ নাই। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলিব? ইহার পর যখন খ্রীষ্ট নিজমুখে বলেন, আমি আর আমার পিতা অভিন্ন;—I and my Father are one. —তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনিই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব?

এই যে ঈশ্বর, যিনি অনাদি, নিত্য, কালাতীত; যিনি চিরমুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, bondman সাজিয়াছিলেন; তিনি বস্তুতঃ ভূমা হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন; আপনাকে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন; তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া দুঃখ তাপের অধীন হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও, তাঁহার ঈশ্বরত্ব অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খ্রীষ্টান বলেন, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তাঁহার বন্ধন একটা অভিনয় মাত্র।

আপনারা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহবাদের কথা শুনিয়াছেন। এই ভাগবত মত খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতে এই মতের সবিশেষ উল্লেখ আছে; মহাভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টজন্মের পরে মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল এ কথাটা আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই ভাগবত মতের নাম চতুর্ব্যূহবাদ; রামানুজ স্বামী ইহাকে চাতুরাত্ম্য উপাসনা বলিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টসমাজের Trinity বা ত্রিব্যূহবাদের অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য যে, কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, এই গণ্ডগোলের কথা আপনা হইতেই উঠে।

খ্রীষ্টানেরা বলেন, একই ঈশ্বর ত্রিধা অবস্থিত; তিন পুরুষরূপে অবস্থিত—Father, Son এবং Holy Ghost; অথচ এই তিন পুরুষই সমানভাবে ঈশ্বর। তিন জনই সমানভাবে নিত্য ও শাশ্বত, coeternal, অথচ পিতা পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন, beget করিয়াছেন, এবং Holy Ghost পিতা পুত্র উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—proceed করিয়াছেন। তর্ক উঠে যে পুত্র যদি পিতা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়ে নিত্য—co-eternal—হন কিরূপে? উভয়ে সমান ও পূর্ণ ঈশ্বর হন কিরূপে? Arius ও তাঁহার অনুগামীরা এই তর্ক তুলিয়া পুত্রকে পিতা হইতে খাট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বৎসর ধরিয়া তজ্জন্য বিবাদ চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিন পুরুষেরই একাত্মতা ও পূর্ণতা স্বীকৃত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র মতে এক বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহরূপে অবস্থান করেন; ইহারা সকলেই পূর্ণ ঈশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ; অথচ এক জন অন্য জন হইতে জাত। কে কোথা হইতে জন্মিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে "পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধ-সংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে"। পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জন্মেন, এই সঙ্কর্ষণই জীব। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন জন্মেন, এই প্রদ্যুম্ন মন; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্মেন, এই অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধকে লইয়া আমাদের এখন প্রয়োজন নাই; বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের সম্পর্ক দেখুন। বাসুদেব পরব্রহ্ম, কিন্তু সঙ্কর্ষণ জীব। পরব্রহ্ম হইতে জীব জন্মিয়াছেন, অথচ সেই জীবও পরব্রহ্ম। রামানুজ স্পষ্ট বলিতেছেন, "সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি", এক জন জীব, অন্য জন ঈশ্বর, জীব ঈশ্বর হইতে জন্মিতেছেন, অথচ উভয়েই ব্রহ্ম, এই একটা মস্ত হেঁয়ালি। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে হেঁয়ালি উঠিয়াছিল, ঠিক্ সেই

হেঁয়ালি। বেদবাক্য এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। বেদশাস্ত্র ও বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও একবাক্যে জীবকে নিত্য ও জন্মরহিত বলিয়া মানিয়াছেন। জীবের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ" "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজঃ অজরোঽমৃতোঽভয়ঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। বেদপন্থী রামানুজ এই সকল বেদবাক্য ও স্মৃতিবাক্য অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি বলিতেছেন, জীবরূপী সঙ্কর্ষণ যে নিত্য, সে বিষয়ে সংশয় করি না! বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি নিত্য। তবে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের যে উৎপত্তি বলা আছে, তাহা অচেতন ভূতোৎপত্তির মত উৎপত্তি নহে। "বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিত-সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে", বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম আশ্রিতবৎসল, তিনি আশ্রিতগণের আশ্রয় হইবার জন্যই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। রামানুজ পরম বৈষ্ণব; পাঞ্চরাত্র মতকে রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাগবতমতে অনুরাগ ছিল না। তিনি এক নিঃশ্বাসে ভাগবত মত উড়াইয়া দিলেন—বলিলেন, বেদমতে জীব নিত্য, এবং পাঞ্চরাত্র মতে জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন; যাহার উৎপত্তি আছে, সে নিত্য হইতে পারে না; অতএব পাঞ্চরাত্র মত বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। এরয়েসও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য।

আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টানদের জনকেশ্বরের স্থলে বাসুদেবকে ও তনয়েশ্বরের স্থলে সঙ্কর্ষণকে বসাইলে পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রীষ্টীয় মতে কোন ভেদ থাকে না। জনকেশ্বর বাসুদেব স্বয়ং; তিনি আশ্রিতবৎসল; আশ্রিতগণের উদ্ধারের জন্যই তিনি পুত্র খ্রীষ্টকে জন্ম দিয়াছেন। তনয়েশ্বর সঙ্কর্ষণ স্বয়ং, তিনি বাসুদেব হইতে জাত, অথচ বাসুদেব হইতে অভিন্ন। তিনি আবার Son of man, Perfect Man, অতএব তিনিই জীব। জীব ঈশ্বর হইতে জাত, অথচ ঈশ্বরের মতই নিত্য।

খ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। খ্রীষ্টানের ভাষা দিলাম, অপিচ বেদপন্থীর ভাষায় তাহার অনুবাদ দিলাম। কিন্তু খ্রীষ্টের একটা বড় বিশেষণ সম্পর্কে এখনও কিছু বলি নাই। যাবতীয় খ্রীষ্টান একবাক্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিতেছেন—তিনি Word of God. Church of England ইহা মানিয়া লইয়াছেন—the Son which is the Word of the Father. এই বিশেষণটির মূল জোহন প্রচারিত সুসমাচার মধ্যে পাওয়া যায়—সেটা আপনারা জানেন; তথাপি আমি আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি। "In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not any thing made that was made." পুনরায় বলা হইতেছে, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.

মিশনারিদের বাঙ্গালা অনুবাদ "আদিতে বাক্য ছিলেন" লইয়া আপনারা বিদ্রূপ করিয়াছেন; আমি Wordএর বাঙ্গালায় বাক্য বলিব না—আমি বলিব বাক্ বা শব্দ। অমনি আপনারা স্তব্ধ হইবেন। জোহনের অনুবাদে যদি আমি বলি "অগ্রে বাক্ ছিলেন অথবা শব্দ ছিলেন", অমনি আপনারা চমকিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন, এই খ্রীষ্ট তবে ত আর কেহ নহেন; ইনি আমাদের চিরপরিচিত সেই শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতা। বেদপন্থীর সাহিত্য শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ; জোহনের বাক্যে আপনাদের কোনরূপ হেঁয়ালি ঠেকিবে না। শব্দই ব্রহ্ম; শব্দ হইতে লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে; শব্দই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছে; এ সকল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত কথা জোহনের সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; ইংরেজী Word

শব্দের লাটিন অনুবাদ Verbum; গ্রীক অনুবাদ Logos. স্বর্গে তিনি অমূর্ত্ত Logos; মর্ত্ত্যভূমিতে তিনি বিগ্রহবান্ Logos—Word made flesh.—শব্দব্রহ্ম স্থূল দেহ লইয়া অবতীর্ণ। এই Logos নামের পিছনে পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক পণ্ডিত হীরাক্লিটসে এই Logos কে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যাহাকে ঋত বলে, ঐ পণ্ডিত Logos শব্দে তাহাই বুঝিতেন; এই ঋত দ্বারা জগৎ ধৃত আছে, উত্তম্ভিত আছে; ইহাই সেই Cosmic Law, যদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ স্বস্থানে ধৃত আছে, গ্রহগণ আপন আপন পথে চলিতেছে। বেদপন্থীর ভাষায় ইহা ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। বৌদ্ধেরাও ইহাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া ত্রিরত্নের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহার অন্য নাম Psyche বা Principle of Life. ষ্টোয়িকদের হাতে ইনি Reasonএ বা প্রজ্ঞায় পরিণত হইয়াছেন, যে প্রজ্ঞা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরাও কালে ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় বা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত করিয়াছেন। আলেক-জান্দ্রিয়া সহরে ইহুদীদের জমকাল আড্ডা ছিল। সেখানকার ইহুদীরা গ্রীক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহুদীদের একটা পুরাতন সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল; ঈশ্বর বলিলেন, জগৎ হউক, আর জগৎ হইল; এখানে ঈশ্বরের বাক্য হইতে বা শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই শব্দকে তাহারা Memra বলিত। আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে ইহুদীদের এই Memra গ্রীকদের Logosএর সহিত মিশিয়া গেলেন। এই তত্ত্বের পরিণতি হইল, Philo নামক গ্রীকভাবাপন্ন ইহুদীর হাতে। শব্দের সহিত ধর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা মিশিয়া গেলেন; এবং জগতের কর্ত্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব এই প্রজ্ঞাত্মা শব্দ-ব্রহ্মে আরোপিত হইল। Philoর ভাষায় এই শব্দ ঈশ্বর হইতে জাত, সকলের অগ্রে জাত; তিনি আদি জীব, ইতর জীব তাঁহার প্রতিবিম্বরূপী; তিনি ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করিয়া জগদ্বিধান নিয়মিত করেন; প্রজ্ঞা তাঁহার জননী; কোথাও বা তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাত্মা।

সুসমাচার-প্রচারক জোহন যে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন, তাহাতে কেহ সংশয় করেন না। Philo খ্রীষ্টান ছিলেন না। জোহন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে বসিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টকেই শব্দ-ব্রহ্মরূপে প্রচার করিলেন, এবং শব্দব্রহ্মের সমুদয় বিশেষণই খ্রীষ্টে আরোপ করিলেন। ঈশ্বর যে নরদেহ ধারণ করিতে পারেন, কোন জীব যে ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহুদীর পক্ষে ইহা কল্পনাতীত। জোহন কিন্তু খ্রীষ্টের সেই দিক্‌টাতেই জোর দিলেন। তিনি অগ্রে শব্দরূপে বিদ্যমান ছিলেন; তিনি নরদেহ গ্রহণ করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন; জীবের মঙ্গলের জন্য আপনি জীবলীলার অভিনয় করিলেন। খ্রীষ্টের ক্রুসে আরোহণটাই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ, কেননা ঈশ্বরের জীবত্ব-গ্রহণই আত্মোৎসর্গের ব্যাপার। যে বড়, সে ছোট হইলেই তাহার আত্মোৎসর্গ হইল। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে; সৃষ্টির আদি হইতেই ইহার ব্যবস্থা হইয়া আছে। খ্রীষ্টানের ভাষায় the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self-sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was Man. ঈশ্বর যে জীব হইবেন, যিনি নিত্যমুক্ত, তিনি যে বদ্ধ সাজিবেন, ইহা জগৎ-সৃষ্টিরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য; ইহাই তাঁহার জগতে আত্মপ্রকাশের নিগূঢ় রহস্য।

আমি তুলনামূলক আলোচনায় বসিয়াছি—পুঁথি ঘাঁটিয়া খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের যে তাৎপর্য্যটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। খ্রীষ্টানের মতে খ্রীষ্ট শব্দ-স্বরূপ, বাক্যস্বরূপ,—বেদপন্থীর ভাষায় তিনি শব্দ-ব্রহ্ম, এবং বাগ্‌দেবতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব। মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোন ভিন্ন ভেদ নাই। তিনি চিরমুক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার সৃষ্ট জগতে

আত্মপ্রকাশার্থ বদ্ধজীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাকে খাট হইতে হইয়াছিল—যিনি মহৎ, তাঁহাকে, ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছিল, জগতের সম্মুখে আপন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্যই তিনি এইরূপে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের ভাষায়ঃ ইহা লীলাকৈবল্য। ইহা জাগতিক বিধান—জগৎসৃষ্টিই এই আত্মবিসর্জ্জন। যে সকল ইতর ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান,—ঈশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ ধরিয়া যে সকল ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান—যাহারা স্বকৃত পাপের ভরে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে রহিয়াছে, যাহারা সেই পাপের ভরে মৃত্যুর বশ হইয়াছে, অমরতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে,—সেই অগ্রজন্মা আদি জীব এই আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা তাহাদের পাপ নাশ করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে দেখাইলেন, যে পাপ চিরস্থায়ী নহে; খ্রীষ্টকে জানিলেই, খ্রীষ্টের স্বরূপ জানিলেই জীবেশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিলেই, এই পাপ থাকিবে না, তখন সে অমরতার অধিকার পাইবে—তাহার স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন খুলিয়া যাইবে। যে নিত্যমুক্ত হইয়াও আপনাকে বদ্ধ মনে করে, বদ্ধবৎ আচরণ করে, সে মুক্ত হইবে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে দারুণ ব্যবধান, সে স্বেচ্ছাক্রমে কল্পনা করিয়াছে, সে ব্যবধান লুপ্ত হইবে। এজন্য খ্রীষ্টের সহিত তাহার একাত্মতা-স্থাপন আবশ্যক। খ্রীষ্ট মাববলীলায় ক্রুসের উপরে মরণাভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ছেন; তিনি মরণাভিনয় দ্বারা মরণজয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সেই যজ্ঞকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃ-শেষ তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। এই যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা একটা অভিনয়, মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন অভিনয়, উহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা সত্য জ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত-মশ্নুতে"—অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ খ্রীষ্ট যে যজ্ঞিয় পশু সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ

করিয়া খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা—communion প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্ত মাংস খায়—eucharist খায়, খ্রীষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ লইয়া খ্রীষ্ট সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে—যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা খ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, আত্মস্থ করে, খ্রীষ্টের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে প্রেরিত হয়।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়; এই কথা লইয়া আমি আরম্ভ করিয়াছি। ক্রুসে আরোহণের পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর রুটি ও মদ ছিল। খ্রীষ্ট বলিলেন, এই রুটি আমার মাংস, এই মদ আমার রক্ত; ইহা তোমরা খাও। এই বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ঐ রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিলেন। পরদিনে তিনি পশুরূপে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে আহুতি দিলেন। পূর্ব্বদিনের ঐ অনুষ্ঠান পরদিনের যজ্ঞাভিনয়ের rehearsal স্বরূপ। খ্রীষ্টানেরা তদবধি ঐ রুটি ও মদ খাইয়া আসিতেছে; উহাতে সেই যজ্ঞিয় পশুর রক্ত মাংস খাওয়াই হইতেছে—ঐ যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণই হইতেছে। এই ভক্ষ্য দ্রব্যের নাম eucharist; eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা-প্রাপ্তির অনুকূল, বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রাপ্তির অনুকূল, পশুর পক্ষে পশুপতিত্ব প্রাপ্তির অনুকূল। মনে রাখিবেন, খ্রীষ্ট যজ্ঞে পশু হইয়াছিলেন; ক্রুসটাই সেই যজ্ঞের যূপ। যিনি স্বয়ং পশুপতি, তিনি পশু সাজিয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিলেন, পশুরূপে মৃত্যু স্বীকার করিয়া মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন; ইতর পশুরা সেই পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া পশুপতির সহিত একাত্মতা লাভ করিবে; এইরূপে পশুজন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আশ্চর্য্য যে, আমাদের দেশেও পাশুপত দর্শনের ভাষায়, শৈবসম্প্রদায়ের ও শাক্তসম্প্রদায়ের ভাষায়, পশু শব্দের অর্থ বদ্ধ জীব, পশুপতি অর্থে ঈশ্বর; পশু জন্ম হইতে অব্যাহতির নাম মুক্তি। খ্রীষ্টানের eucharist

সম্বন্ধে খ্রীষ্টানের কথা না শুনিলে আপনারা হয়ত মানিয়াও মানিবেন না ; তাই পুনরায় একজন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদের কথা শুনাইতেছি—"The sacrifice of Christ was once offered on the cross"—ক্রসে আত্মদান করিয়াই খ্রীষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—ইতিহাসে এই একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। "It is offered to the Father, and to the son, and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrifice." ঐ যজ্ঞের দেবতা জনকেশ্বর, ঐ যজ্ঞের দেবতা তনয়েশ্বর ; ঐ খ্রীষ্ট স্বয়ং একাধারে ঋত্বিক্, পশু এবং দেবতা। তিনি আপনাকেই আপনার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছেন, আবার বলি, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। "On the Cross and in the Eucharist there is one Sacrifice"—ক্রসের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, eucharist ভক্ষণকালেও সেই যজ্ঞেরই পুনরভিনয় হয়—উভয়ই এক যজ্ঞ। "He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Eucharist." এই হবিঃশেষ ভক্ষণেই মানব খ্রীষ্টের সহিত মিলিত হয়—জীবেশ্বরে একতা সম্পাদিত হয়। "It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into His body and blood."—মন্ত্রোচ্চারণের পর যখন রুটি ও মদ খ্রীষ্টের রক্ত মাংসে পরিণত হয়, ঠিক তখনই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। "He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever"—ক্রসের উপর মহাযজ্ঞে তিনি নিজেই ঋত্বিক্ ছিলেন —কিন্তু সেই ঋত্বিক্ কর্ম্ম হইতে এখনও তিনি নিবৃত্ত হন নাই ; তাঁহার পিতার নিকট সেই যজ্ঞ আজিও অর্পিত হইতেছে, এবং চিরদিন অর্পিত হইবে।

আজিকার মত আমি এইখানেই ছুটি লইতে চাহি। আজ বৈদিক যজ্ঞের কথা একবারে তুলি নাই বলিলেই হয়। আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা বলিলাম। আমি আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। বেদপন্থী সমাজে বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি দেখাইতে চাহি। আমি দেখাইতে চাহি, এই যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া বেদপন্থী সমাজ ধৃত ছিল; ধৃত ছিল কেন, এখনও ধৃত আছে। এখন শ্রৌতযজ্ঞগুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি; যজ্ঞের দেবতাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি; অথচ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা যজ্ঞকে ধরিয়া আছি; যজ্ঞের তাৎপর্য্য ঠিক রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে যজ্ঞকে ধরিয়া আছি। আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, আমাদের লোকস্থিতি ও লোকযাত্রা আজি পর্য্যন্ত যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই তাৎপর্য্যটি ধরিতে না পারিলে বেদপন্থী সমাজে লোকস্থিতির গূঢ় রহস্যটি বুঝা যাইবে না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজের আগাগোড়া যে একটি অবচ্ছেদহীন সূত্র ধরিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেটি ধরিতে পারিবেন না। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ব্যাপারটি একটা symbol; সমাজ মধ্যে আমাদিগকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে, তাহারই symbol. ঐ হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠানটির গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে কয়েকবারে নানা যজ্ঞের বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে শুনাইয়াছি—অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ শুনাইয়াছি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুধের আহুতি দিয়া সেই দুধ কিঞ্চিৎ খাইতে হয়; পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পুরোডাশ আহুতি দিয়া তাহার অবশেষ খাইতে হয়; পশুযজ্ঞে পশুমাংস আহুতি দিয়া তাহার কিয়দংশ খাইতে হয়; সোমযজ্ঞে সোমরস দেবতাকে দিয়া সোমরসের অবশেষ পান করিতে হয়। ইহাই হবিঃশেষ-ভক্ষণ। যজমান একা খাইলে চলে না; ঋত্বিক্ ও যজমানে একযোগে খাইয়া থাকেন। এই একযোগে খাওয়াই

communion. ইহা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। গৃহস্থের সহিত একদিকে সমাজের, অন্যদিকে দেবতার মিলন সাধনই এই communion. এই অনুষ্ঠান বিনা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না—ধরিতে গেলে এই অনুষ্ঠানেই যজ্ঞের সমাপ্তি। এই সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপক তাৎপর্য্য আছে। সামাজিক জীবনে সেই তাৎপর্য্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে সমাজ মধ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। আমি দেখাইলাম, এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান। নানা জাতির মধ্যেই ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ-ভক্ষণ অনুষ্ঠান eucharist ভক্ষণ। খ্রীষ্টানদের মতে এই eucharist ভক্ষণের তাৎপর্য্য আমি যথাশক্তি আজ বুঝাইয়াছি। বেদপন্থী সমাজে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে আগামী বারে চেষ্টা করিব।

খ্রীষ্টীয় সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, এবং তাহার বহু পুরাতন বেদপন্থী সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট ধার করিয়াছেন কি না, সে প্রসঙ্গ আমি আদৌ তুলিব না। আমি সাদৃশ্য দেখাইয়াই নিরত হইব। তার পরে আমি দেখাইতে চাহি, এই অনুষ্ঠান অথবা এই অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য্য আমাদের বেদপন্থী সমাজ কিরূপ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই ব্যাপকতা বুঝিবার সুবিধা হইবে। সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম; নতুবা খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। খ্রীষ্টানের নিকট যাহার নাম eucharist, বেদপন্থীর নিকট তাহার নাম ইড়া। এই ইড়ার অর্থ বুঝিতে হইবে। আপনারা জানিবেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা। মানবের গার্হস্থ্য জীবন এবং সামাজিক জীবন, এমন কি মানবের আধিভৌতিক

জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, মানবের পার্থিব জীবন এবং অপার্থিব পারমার্থিক জীবন—এক কথায় সমগ্র মানব জীবনের এই ইড়া-ভক্ষণেই সম্পূর্ণতা এবং সমাপ্তি এবং সার্থকতা। ইহাই আমাদের religion এবং ইহাই আমাদের ethics. এই ইড়া-ভক্ষণের অর্থ এবং তৎপরতা বুঝাইয়া বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি কোথায়, বেদপন্থী সমাজের গাঁথনী কোথায়, তাহা আমি বাহির করিতে চাহি। আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমি এই পরম তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি অর্পণ করিব। আপনাদিগকে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

# পুরুষ-যজ্ঞ।

খ্রীষ্ট যজ্ঞের কথা বলিয়াছি। খ্রীষ্ট-যজ্ঞে হবিঃশেষের নাম ইউকেরিষ্ট। যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; উহা খাইলে দেবতাকেই খাওয়া হয়; দেবতাকে আত্মস্থ করিলে দেবতার সহিত ঐক্য ঘটে। ঐ দেবতাটি কে? ইনি স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হইলেও অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতারূপে অনাদি, নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আবার পরিপূর্ণ জীব—যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব। তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করিয়াছেন; এবং সেই যজ্ঞে আপনাকেই পশুরূপে—মেষরূপে—কল্পনা করিয়া জীব-হিতার্থ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইউকেরিষ্ট সেই পশুর রক্ত ও মাংস—উহা খাইলে ইতর যজমান দেবতার সহিত একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করিয়া

অমরতা পায়। কেননা, খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃত স্বরূপ।

এখন বেদপন্থীর যজ্ঞে আসিব। বেদপন্থীর যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হইত—ইষ্টি যাগে মাংসের বদলে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত। সোমযজ্ঞে সোমরস দেওয়া হইত। যজ্ঞবিশেষে সোমরসের বদলে সুরা বা আর কিছু দেওয়া হইত। এখন প্রশ্ন যে, এই সকল দ্রব্যে কোন দেবতার অধিষ্ঠান হয় কি না? সে কোন্ দেবতা? সে দেবতার সহিত যজমানের সম্পর্ক কি?

প্রথমে সোমরসের আলোচনা করিব। ইহুদির দেবতা জেহোবা রক্তপ্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্ট মেষস্বরূপ হইয়াছিলেন; মেষরূপেই আপনার রক্ত দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা যে সুরাপান করেন, ঐ সুরা খ্রীষ্টের রক্ত। সোমরস কিন্তু দেবতার রক্ত হইতে পারে না, কেননা, বেদপন্থীর দেবতা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুযজ্ঞে পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য; রাক্ষসদের জন্য উহা বেদির পার্শ্বে উৎকরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সোমরস রক্ত নহে, তবে উহা অমৃতস্বরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোম যজ্ঞ প্রসঙ্গে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সোমপানে অমরতা পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, সোম রসের পরিবর্তে ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির রস পান করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষ ভাবে সোম পানই হইত। কেননা, এই যে বটবৃক্ষ, ইহা পরোক্ষভাবে সোমেরই স্বরূপ। ক্ষত্রিয় "সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সেই বটের রস পান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেকের পর ক্ষত্রিয় রাজা সুরা পান করিতেন। রাজার হাতে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র দেওয়া হইত। "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ" এই মন্ত্রে রাজার হাতে দেওয়া হইত। এই মন্ত্রে সুরাকেই সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। বলা হইতেছে, অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য তোমার অভিষব হয়; তোমার স্বাদু

ও মাদক ধারার দ্বারা এই রাজাকে পূত কর। পানান্তে রাজা সেই সুরাশেষ তাঁহার কোন বন্ধুর হাতে দিতেন। এক পাত্রে সুরাপানে উভয়ের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইত। সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরা দেওয়া হইত; বিধিমতে সন্ধান বা fermentation দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিয়া সেই সুরা দেওয়া হইত। এই যজ্ঞের দেবতা ছিলেন, অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী, আর ইন্দ্র সুত্রামা। অধ্বর্য্যু আগুনে দুধ ঢালিয়া দিতেন; তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা সেই সঙ্গে সুরা ঢালিয়া দিতেন। সুরাহুতির মন্ত্র—"যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীষু সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য, তেন জিন্ব যজমানং মদেন, সরস্বত্যশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিং স্বাহা" এই মন্ত্রে সুরাকে স্পষ্টতই সোম-স্থানীয় বলা হইয়াছে। কালক্রমে এই যজ্ঞেও সুরাপান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুরার পরিবর্ত্তে দুধ চলিবে। দ্বিজাতিসমাজে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে—সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচের হত্যাপরাধে শুক্রের অভিশাপে সুরা অপেয় হইয়াছে, এই পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্র শাস্ত্র কিন্তু সুরাকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র দ্বারা সুরাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সুরাপানের ব্যবস্থা করিলেন। সুরা-শোধনের জন্য একেবারে ব্রহ্মের দোহাই দেওয়া হইল। "বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি, তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু"—এইরূপে দোহাই দিলে আর কি ব্রহ্মহত্যার পাপ থাকিতে পারে? তান্ত্রিকদিগের সুরাশোধনের আসল মন্ত্রটি বৈদিক মন্ত্র—"হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরীক্ষসৎ, হোতা বেদিষৎ অতিথিদুরোণসৎ, নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ, অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।" এই মন্ত্রটি ঋগবেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে আছে। ইহার ঋষি স্বয়ং বামদেব, যিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই ঋকের নাম হংসবতী ঋক্। যাবতীয় ঋগ্‌মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের পরেই বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক

হংসমন্ত্রের বা অজপামন্ত্রের মূল এই হংসবতী ঋক্। ঐ মন্ত্রে যে হংসের কথা উল্লেখ হইতেছে, সেই হংস এককালে হয়ত আদিত্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে প্রায় একবাক্যে তিনি ব্রহ্ম অর্থে গৃহীত হইয়াছেন। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়াছেন। মন্ত্রটির অর্থ, এই যে হংস বা ব্রহ্ম, তিনি দ্যুলোকে আছেন, অন্তরিক্ষে বাস করিতেছেন, হোতারূপে বেদিতে উপবিষ্ট আছেন, অতিথিরূপে গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আছেন, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেখানে রহিয়াছেন, ব্যোমে অবস্থিত আছেন, সত্যে অবস্থিত আছেন, অপসমূহ হইতে ইঁহার জন্ম, গো অর্থাৎ বাক্য হইতে ইঁহার জন্ম, অদ্রি হইতে ইঁহার জন্ম, সত্য হইতে ইঁহার জন্ম, ইনি সত্যস্বরূপ। তান্ত্রিকেরা এই মন্ত্রে সুরাশোধন করিলে সুরা একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। খ্রীষ্টান যাজক মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবামাত্র সুরা যেমন খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়, সেইরূপ। সোম যেমন অমরতা দেন, সুরাও তেমনি অমরতা দিয়া থাকেন।

এখন আপনারা খ্রীষ্টপন্থীর সুরাপানের সহিত বেদপন্থীর সোমপানের, আর তন্ত্রপন্থীর সুরাপানের সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টানেরা যেমন দেবতাকে আত্মসাৎ করেন, বেদপন্থীও সেইরূপ করেন। এই যে সোম, ইনি স্বয়ং এক জন দেবতা, দেবগণের মধ্যে ইনি এক জন রাজা। সোম যজ্ঞে সোম ক্রয় করিয়া যখন যজ্ঞশালায় আনা হয়, তখন তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানই দেওয়া হয়। যজ্ঞশালায় তাঁহাকে রাজার মত উচ্চ আসনে রাখা হয়। রাজা অতিথিরূপে যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আতিথ্য ইষ্টি যজ্ঞ করা হয়। সোম যাগের পূর্ব্ব দিনে যখন তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া মহাবেদির উপরে হবির্ধান-মণ্ডপে রাখা হয়, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য পশু যাগ করিতে হয়। সোম যজ্ঞে এই দেবগণের রাজা সোমকেই ভক্ষণ করা হইতেছে। স্পষ্টই

বলা হইতেছে—"সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষয়ামি।" এখন আপনারা খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের সহিত বেদপন্থীর দেবতা ভক্ষণের তুলনা করুন।

খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট ত অনাদি নিত্য বাগ্‌দেবতা। সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক কি? আমার সঙ্গে আসুন; চমকাইবেন না। আমাদের বেদসাহিত্যে সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি। বাগ্‌দেবতাই সোম আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে নানা স্থানে সোম আহরণের আখ্যায়িকা আছে। কোন পাখী দেবতাদের জন্য সোম আনিয়াছিল; সেই পাখীকে শ্যেন বা সুপর্ণ বলা হইতেছে। কোথাও বলা হইতেছে শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ দূরদেশ হইতে সোম আনিয়াছেন। কোথাও বলা হইতেছে তার্ক্ষ্য পক্ষী সোম আনিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, গায়ত্রী সুপর্ণী হইয়া সোম আনিয়াছেন; তার্ক্ষ্য অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। বেদের এই তার্ক্ষ্য পুরাণের গরুড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র বলা হইতেছে, দেবতারা সোম আনিবার জন্য বেদের ছন্দগুলিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ছন্দেরাই পাখী বা সুপর্ণ সাজিয়া সোম আনিতে উপরে উঠিলেন। প্রথমে জগতী উঠিলেন, পরে ত্রিষ্টুপ্ উঠিলেন; তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শেষে গায়ত্রী উঠিলেন। সোম গন্ধর্ব্বদের মধ্যে ছিলেন। কৃশানু নামক গন্ধর্ব্বের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গায়ত্রীরূপা সুপর্ণী দুই পা এবং মুখ দিয়া সোমকে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। অতএব যে পাখী সোম আনিলেন, তিনি গায়ত্রী; আর কেহ নহেন; এই গায়ত্রী কিন্তু ছন্দের মধ্যে প্রধান; তিনি ছন্দসাং মাতা। এই অর্থে তিনি বেদবাক্যের প্রধান, স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। সোম ক্রয় উপলক্ষে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। বাগ্‌দেবী দেবগণকে বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীপ্রিয়, আমাকেই তোমরা পাঠাও, আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিব। এই বলিয়া বাগ্‌দেবী নগ্না কুমারীরূপে সোম

আনিতে গেলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে বঞ্চনা করিয়া সোম লইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অভিনয়ে সোম যজ্ঞে একটি ছোট গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবীর স্থানীয়। মনে রাখিবেন 'গো' শব্দের একটা অর্থ 'বাক্য' বা 'বাক্'। সোমাহরণ সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান পাইলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা এই কয়েকটি উপাখ্যানকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছেন, কদ্রু, এবং সুপর্ণী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। বেদের এই সুপর্ণী পুরাণে বিনতা হইয়াছেন। এই বিনতারই পুত্র গরুড়। কদ্রুর জয় হইয়াছিল। সুপর্ণী তাঁহার দাসী হইয়াছিলেন। কদ্রু বলিলেন, তৃতীয় দ্যুলোকে যে সোম আছেন, তাঁহাকে যদি আনিতে পার, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন করিব। বেদের ছন্দগুলি এই সুপর্ণীর সন্তান। মায়ের আদেশে ছন্দেরা সোম আনিতে উঠিল; জগতী পারিল না, ত্রিষ্টুপ্‌ও পারিল না, কনিষ্ঠা গায়ত্রী সমর্থ হইলেন। দুই পা এবং মুখ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সোমকে নামাইয়া আনিলেন। পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু সোমকে আট্‌কাইলেন। তখন দেবতারা বাগ্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাগ্‌দেবী গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিলেন। গায়ত্রী এই সময় রোহিণী বা রক্তবর্ণ মৃগীর রূপ ধরিয়াছিলেন; তদনুসারে রক্তবর্ণের গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হয়। এখানে বাগ্‌দেবী ও গায়ত্রীকে ভিন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু উভয়েই সোম আনয়ন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবীই সোম আনেন। এখন বাগ্‌দেবীর সহিত সোমের সম্পর্ক আপনারা বুঝিতে পারিলেন। অমৃতস্বরূপ সোমকে পূর্ব্বে কেহ জানিত না; স্বয়ং বাগ্‌দেবতা তাঁহাকে দেবগণের জন্য আনয়ন করেন। তাহার পর মনুষ্যেরাও তাঁহাকে পাইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষ্ট স্বয়ং বাগ্‌দেবতা—Word become flesh. তিনিও স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপন্থী যজমান যেমন সুরাপান

করিয়া অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেইরূপ সোম পান করিয়া অমরতা পান। সোমপান কালে তিনি বলেন, "বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু"—বাগ্‌দেবী প্রীত হইয়া সোমরসে তৃপ্ত হউন; আবার বলেন "দেবকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, মনুষ্যকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, পিতৃকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি"—দেবকৃত পাপের তুমি বিনাশ কর, মনুষ্যকৃত পাপের বিনাশ কর, পিতৃকৃত পাপের বিনাশ কর—পুনরায় বলেন—"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্, কিং নূনমস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ, কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য"—আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি, জ্যোতি পাইয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি; আমরা অমর; মর্ত্ত্য পাপে আর আমাদের কি করিবে? যিনি সোম পান করেন, স্বয়ং বাগ্‌দেবী আসিয়া তাঁহাকে অমরতা দেন। তিনিই ত সোমকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমের কথা বলিলাম। এবার পুরোডাশের কথা বলিব। পুরোডাশ আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাইতে হয়। কয়েক খণ্ডে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। এক এক ভাগ এক এক ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সকল ভাগের নাম ইষ্টি যাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পুরোডাশের একটা খণ্ড থাকে, যাহা যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে খাইয়া থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছি, ইড়া-ভক্ষণই যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। এই ইড়া-ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে, যজ্ঞ সার্থক হয়। খ্রীষ্টানের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণে নানাবিধ খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম breaking of the bread; খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের সহিত ভোজন-কালে রুটি ভাঙ্গিয়াছিলেন, ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, This is My body which is broken for many for the remission of sins. তদনুসারে

খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে রুটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে যজমান-দিগকে বাঁটিয়া দেন। খ্রীষ্টানেরা এই রুটি ভাঙ্গার গভীর তাৎপর্য্য দিয়াছেন। জীবহিতের জন্য খ্রীষ্ট আপনাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ডিত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. পুনশ্চ—Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, Consecration and Invocation—ভক্ষণের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করিয়া রুটি উৎসর্গ করিতে হয়। সম্প্রদায়-ভেদে মন্ত্রের ভিন্নতা আছে; কেহ বা বাগ্‌দেবতারূপী খ্রীষ্টকে আহ্বান করেন, কেহ বা Holy Ghostকে আহ্বান করেন; কেহ বা Trinityকে আহ্বান করেন। অনেকের মতে এই আহ্বানমন্ত্র পাঠের পরই দেবতার আবির্ভাব হয় ও রুটি মাংসে পরিণত হয়। খ্রীষ্টপন্থীর যজ্ঞে যেরূপ, বেদপন্থীর যজ্ঞেও ঠিক তদনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র, উহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ড অগ্নীৎ ভক্ষণ করেন: ইহার নাম ষড়বত্ত। আর এক খণ্ড চারি অংশে ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ এই চারিজনে ভক্ষণ করেন; ইহার নাম চতু-র্দ্ধাকৃত ভাগ। আর দুই খণ্ড ব্রহ্মা ও যজমান যজ্ঞসমাপ্তির পর ভক্ষণ করেন, উহা ব্রহ্মার ভাগ ও যজমানের ভাগ। এইরূপে পুরোডাশকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার নাম পুরোডাশের অবদান; ইংরাজিতে fraction বা breaking. এই সকল ভাগ ব্যতীত যজমান ও ঋত্বিক্ সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য একটা ভাগ থাকে, ইহার নাম ইড়া। ইহা রাখিবার জন্যএকখানি কাঠের পাত্র থাকে; উহার নাম ইড়াপাত্র। পূর্ণ মাস যাগে অধ্বর্য্যু পুরোডাশের খণ্ড কাটিয়া লইয়া সেই

ইড়াপাত্রে রাখেন। প্রথমে ইড়াপাত্রে একটু ঘি ঢালা হয়; সেই ঘিয়ের উপরে দুইখানা পুরোডাশ হইতে দুই খণ্ড কাটিয়া রাখা হয়; আবার একটু ঘি ঢালা হয়। এইরূপে নীচে উপরে ঘি মাখান পুরোডাশ খণ্ডের নাম ইড়া। অধ্বর্য্যু হোতার আঙুলে ঘি মাখাইয়া দেন। হোতা সেই আঙুল দিয়া আপনার ঠোঁট মাজেন। অধ্বর্য্যু হোতাকে ইড়াপাত্র ধরিতে দেন। যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে ইড়াপাত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন। হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রে ইড়া দেবতাকে সমীপে আহ্বান করা হয়। মন্ত্র পাঠের নাম ইড়ার উপহ্বান; ইংরেজিতে Invocation. এই আহ্বানের পর ইড়াদেবী পুরোডাশ খণ্ডে আবির্ভাব করেন। তৎপরে আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলিয়া ইড়া ভক্ষণ করেন। ইড়াদেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপন্থীর ও বেদপন্থীর অনুষ্ঠানে কতটা মিল তাহা দেখিলেন।

এই ইড়াদেবতাটি কে? ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্ট স্বয়ং যজমান, স্বয়ং পশু, স্বয়ং দেবতা—বাগ্‌দেবতা—Word of God. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "যজমানো বৈ পুরোডাশঃ"—এই যে পুরোডাশ ইহা যজমানই; পুরোডাশ আহুতির দ্বারা যজমান আপনাকেই আহুতি দিতেছেন। আপনার নিষ্ক্রয়রূপে তিনি পশু দিতে পারিতেন; কেন না, "পশবঃ পুরুষঃ", পশুগণই পুরুষস্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যস্থানীয়। এখানে যজমান সেই পশুর পরিবর্ত্তে পুরোডাশখণ্ড দিতেছেন। অতএব সেই পুরোডাশখণ্ড বা ইড়া পশুস্থানীয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণই আবার বলিতেছেন, "পশবো বৈ ইড়া"—এই যে ইড়া, ইহা ত পশু। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টরূপী পশুর মাংস, এই ইড়াও সেইরূপ যজমানরূপ পশুর মাংস। ভাল কথা, হোতা তবে মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতাকে আহ্বান করিলেন? এই দেবতারও নাম ইড়াদেবী। আপনারা এই ইড়াদেবীকে চেনেন কি? আশ্চর্য্য হইবেন, ইড়াদেবী স্বয়ং বাগ্‌দেবতা; সমস্ত বৈদিক সাহিত্য এককালে

ইহাঁর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। যে মন্ত্রে ইড়াকে আহ্বান হয়, সেই মন্ত্রটি শুনুন—হোতা ইড়াদেবীকে ডাকিতেছেন :—

"সুরূপবর্ষবর্ণে এহি"—অগ্নি দেবি, তোমার রূপ সুন্দর, বর্ণ সুন্দর, বর্ষণ-শক্তি ( বা উৎপাদন-শক্তি ) সুন্দর; তুমি এখানে এস। "ইমান্ ভদ্রান্ দুর্য্যান্ অভ্যেহি"—আমাদের এই সজ্জিত যজ্ঞগৃহের অভিমুখে এস। "মামনুব্রতা নি উ শীর্ষাণি মৃড্ঢ্বম্"—আমরা যে ব্রত লইয়াছি, তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া আমাদের শীর্ষে কল্যাণ অর্পণ কর। "ইড়ে এহি, অদিতে এহি, সরস্বতি এহি"—ইড়া তুমি এস, অদিতি তুমি এস, সরস্বতি তুমি এস।" রন্তিরসি, রমতিরসি, সূনরীরসি,"—তুমি আনন্দময়ী, তুমি আনন্দদায়িনী, তুমি সুন্দরী। "জুষ্টে জুষ্টিং তে অশীয়"—তোমার পূজা করি, তুমি আমাদিগকে প্রীতি দাও। "উপহূতে উপহবং তে অশীয়"—তোমাকে আমরা ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া লও। "সত্যা আশীরস্ত যজ্ঞস্য ভূয়াৎ"—এই যজ্ঞে যে আশিষ চাহিতেছি, তাহা সত্য হউক। "অরেড়তা মনসা তচ্ছকেয়ম্"—স্থির মনে তাহার শক্তি লাভ করিব। "যজ্ঞো দিবং রোহতু, যজ্ঞো দিবং গচ্ছতু, যো দেবাযানঃ পন্থা তেন যজ্ঞো দেবান্ অপ্যেতু"—এই যজ্ঞ দিব্যলোকে আরোহণ করুক, দিব্যলোকে গমন করুক, দেবগণের যে পথ আছে, সেই পথে দেবগণের সমীপে চলুক। "অস্মান্ ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু"—যিনি বলবিধাতা ইন্দ্র, তিনি আমাদের বলবিধান করুন। 'অস্মান্ রায় উত যজ্ঞাঃ সচন্ত"—আমরা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করি, আমরা যজ্ঞ লাভ করি। "অস্মাসু সন্তু আশিষঃ, সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্ত্তিঃ মঘোনী"—অগ্নি ইড়ে, তুমি আমাদের প্রিয়া, তুমি বিঘ্নঘাতিনী, তুমি কল্যাণদায়িনী; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হউক।

এই মন্ত্র হইতে ইড়াদেবীর মাহাত্ম্যের কিছু পরিচয় পাইলেন। ইহাঁর আর দুইটী নাম পাইলেন—অদিতি এবং সরস্বতী। দেখা যাক, ইড়া-

দেবীর আর কোন নাম আছে কি না? ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে ইড়ার নাম ছড়াইয়া আছে। পশুযাগ-প্রসঙ্গে আপ্রী মন্ত্রের কথা বলিয়াছি। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ করিতে হয়। পশু যাগে এগার জন দেবতার উদ্দেশে এগারটি প্রযাজ যাগ হয়। প্রত্যেক প্রযাজের পূর্ব্বে হোতা যে মন্ত্র পড়েন, তাহার নাম আপ্রী মন্ত্র। দেবতা এগার জন, কাজেই মন্ত্রও এগারটি। ঋগ্বেদের যে সূক্ত মধ্যে এইরূপ এগারটি আপ্রী মন্ত্র থাকে, তাহার নাম আপ্রী সূক্ত। ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দশটি আপ্রী সূক্ত আছ। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি বড় বড় ঋষি আপ্রী সূক্ত প্রচার করিতেছেন; আপ্রী সূক্তের প্রচারে যেন বিশেষ বাহাদুরী আছে। যে যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, তিনি তাঁহারই আপ্রী সূক্ত ব্যবহার করিতেন, অন্যের করিতেন না। ইহাতেও আপ্রী সূক্তের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আপ্রী সূক্তের এগার মন্ত্রের এগার দেবতা। অষ্টম দেবতার বেলায় কিন্তু তিনটি নাম একযোগে দেখা যায়—ইড়া, ভারতী, সরস্বতী। গোটাকয়েক আপ্রী মন্ত্র শুনুন। "ইড়া সরস্বতী মহী, তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ, বর্হিঃ সীদন্তু অস্রিধঃ"—এই মন্ত্রটি মেধাতিথির। "ভারতীড়ে সরস্বতি, যা বঃ সর্ব্বা উপব্রুবে, তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে"—এইটি অগস্ত্যের। "আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা, ইড়া-দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ, সরস্বতি সারস্বতেভিরর্বাক্, তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু"—এটি বশিষ্ঠের। এইরূপ দশটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রেই ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই তিনটি নাম পাইতেছেন। ইঁহাদিগকে "তিস্রো দেব্যঃ" বলা হইতেছে, অথচ ইঁহারা তিনে এক। কেন না, এক একটি মন্ত্র এক এক দেবতারই উদ্দিষ্ট। ইহার মধ্যে ভারতীর এবং সরস্বতীর নাম আজি পর্য্যন্ত আপনাদের সুপরিচিত। এই দুই নামই বাগ্‌দেবীর নাম। ইড়াদেবীকে আপনারা ভুলিয়াছেন, কিন্তু ভারতী ও সরস্বতী যদি বাগ্‌দেবী হন, তাহা হইলে ইড়াও বাগ্‌দেবী। অতি

প্রাচীন কালে হয়ত ইঁহারা পৃথক্ দেবতা ছিলেন ; কালে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী বহু স্থলে নদীর নাম। এখন সরস্বতী নদী লুপ্ত, কিন্তু এককালে ইনি বেগবতী ছিলেন। একালে যেমন গঙ্গার মাহাত্ম্য, সেকালে সেইরূপ সরস্বতীর মাহাত্ম্য ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে সরস্বতীতীরে ব্রহ্মবাদীরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিষ্ঠার সহিত বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, একদা ঋষিগণ সরস্বতীরে সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবষ নামে একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিল ; সে দাসীপুত্র এবং অব্রাহ্মণ। ঋষিরা তাহাকে মরুভূমিতে খেদাইয়া দিলেন। পিপাসার্ত্ত কবষের মুখ হইতে ঋগ্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। মন্ত্র শুনিয়া স্বয়ং সরস্বতী মরুভূমিতে স্রোত ফিরাইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন এবং কবষের পিপাসা-শান্তি করিলেন। তদবধি কবষ ঋষি হইলেন। কবষের মন্ত্রগুলিও সোমযজ্ঞে স্থান পাইল। এই মন্ত্রগুলির নাম অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্র। সোম-যজ্ঞের দিন প্রত্যূষে যখন 'একধনা' নামক জল আনা হয়, তৎপূর্ব্বে হোতা এই মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। যে সরস্বতীর এই মাহাত্ম্য, সেই সরস্বতী উত্তরকালে বেদবাক্যের দেবতা বা বাগ্‌দেবতা বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাহার পর ভারতী। ইনি হয় ত ভরতবংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিবর্ণনায় আমাদের সাহিত্য পূর্ণ। কালিদাসের প্রসাদে দুষ্মন্তপুত্র সর্ব্বদমন ভরতের নাম কে না জানে! ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঋষি দীর্ঘতমা দুষ্মন্তপুত্র ভরতকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক করিয়াছিলেন। আরও দেখিবেন, তিনি পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া একশ ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের দিলীপ মহাবল পুত্র রঘুর সাহায্যেও শতক্রতু হইতে পারেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, মনুষ্য যেমন হস্ত দ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ম্ম পূর্ব্বে বা পরে কেহ

করিতে পারেন নাই। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়াই মহাভারত। অধিক কি বলিব, এই ভরতের নাম হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভরতবংশের কুলদেবতা ভারতী ক্রমে বেদপন্থীর প্রধান দেবতা হইয়াছেন। সরস্বতীর ও ভারতীর পরে ইড়াদেবী। ঋগ্বেদে ইহাঁর একটা বিশেষণ মনুষ্বতী বা মানবী। এই বিশেষণটি কিরূপে আসিল, তাহার সন্ধানের জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে যাইতে হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পটি বলিব।

আপনারা বৈবস্বত মনুর নাম জানেন। কালিদাসের ভাষায় ছন্দের মধ্যে যেমন প্রণব, রাজাদের মধ্যে তিনি সেইরূপ আদ্য রাজা ছিলেন। সেই মনু একদিন প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুইতেছিলেন। হাতের কাছে একটি মাছ আসিল। মাছ বলিল, মাছে মাছ খায়, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অসময়ে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু মাছটিকে তুলিয়া জলের জালায় রাখিলেন। মাছ ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন কুলায় না, তখন একটা খালে ফেলিলেন। খালে যখন কুলায় না,তখন সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে জলপ্লাবন ঘটিল। মাছের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মাছ নৌকার নিকট ভাসিতে-ছিল; তাহার শিঙে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মাছ নৌকা টানিয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, এই মাছই পুরাণের মৎস্যাবতার। জলপ্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল; মনু একা বাঁচিলেন। কালে জল নামিয়া গেলে মনু জলের উপরেই যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞে যাহা আহুতি দিলেন, তাহা হইতেই বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মিল। এই কন্যার নামই ইড়া। মনুকন্যা বলিয়া ইহাঁর নাম মনুষ্বতী বা মানবী। ইড়া মনুকে বলিলেন, আমি তোমারই কন্যা, তোমার যজ্ঞেই আমি জন্মিয়াছি। অতঃপর তুমি আমাকেই যজ্ঞে আহুতি দিবে। সেই যজ্ঞ হইতে নূতন প্রজা জন্মিবে। মনু তাঁহাকে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলেন। তাঁহা হইতে নূতন প্রজা জন্মিল; মনুর বংশ রক্ষা হইল। এই বংশই

মানব বংশ। তদবধি যজ্ঞে ইড়ার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞে যে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়, সেই পুরোডাশের অংশই ইড়া। তাহাতে ইড়াদেবী বর্ত্তমান থাকেন; মানবেরা তাহা ভক্ষণ করে। মনুকন্যা ইড়ার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। বেদে তাঁহার নাম ঐড় পুরুরবা। পুরাণের মতে পুরুরবার পিতা বুধ; বুধের পিতা সোম। এই সোম সেই রাজা সোম, যিনি দেবগণের অমৃত। অতএব, এই ইড়াদেবী হইতেই সোম বংশের বা চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যে বংশে দুষ্মন্তপুত্র ভরত জন্মিয়াছিলেন। ভরত বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ইড়া দেবী যে সেই বংশের কুলদেবতা ভারতীর সহিত মিলিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইড়াদেবীর কয়েকটি নাম পাইলেন। ইড়া আহ্বানের মন্ত্রে পাইয়াছেন অদিতি এবং সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে পাইলেন ভারতী ও সরস্বতী। বেদপন্থী তাঁহার দেবতাকে শত নামে, সহস্র নামে, ডাকিয়াও তৃপ্ত হন না। ইড়াদেবীর আর নাম আছে কি? যাস্কের 'নিরুক্ত' খুঁজিয়া দেখুন। এই নিরুক্ত খানি বৈদিক ভাষার dictionary। ইহার আরম্ভে নিঘণ্টু মধ্যে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ বা synonym দেওয়া আছে। 'বাক্' শব্দে আসিয়া দেখুন। সাতান্নটি প্রতিশব্দ দেখিবেন। সাতান্নটি লইয়া আমার প্রয়োজন নাই। গোটাকতক বাছিয়া লইব। 'বাক্' বা বাক্যের প্রতিশব্দ—শব্দ, স্বর, ঘোষ, বাণী ইত্যাদি। তাহার পরে দেখুন—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। আপ্রী মন্ত্রে এই তিন নাম একযোগে পাইয়াছেন। তাহার পরে দেখুন, সুপর্ণী—এই সুপর্ণী গায়ত্রী বা বাগ্‌দেবী রূপে সোম আনিয়াছিলেন। অতঃপর ইড়া যে বাগ্‌দেবী তাহাতে আপনাদের সন্দেহ থাকিল না। তাহার পর কয়েকটি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। একটি নাম অদিতি। ইড়ার এই নাম আগেই ইড়ার আহ্বান মন্ত্রে পাইয়াছেন, অথচ এই অদিতি এখন দেবগণের মাতা। তাহার পর শচী—ইনি এখন ইন্দ্রপত্নী, বেদে ইনি যজ্ঞক্রতুরূপিণী। তাহার পর স্বাহা—

ইনি অগ্নির পত্নী। তাহার পর দেখুন গৌরী—ইনি এখন মহেশ্বরপত্নী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখা যায়। এই উমা হৈমবতী হিমালয়কন্যা পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং ইহাঁরই নামান্তর গৌরী। নিরুক্তকার গৌরীতে আসিয়া থামেন নাই ; আর একটি নাম দিয়াছেন মেনা বা মেনকা ; ইনি গৌরীর জননী। সর্ব্বশেষে নাম মহী বা পৃথিবী, গো এবং ধেনু। পৃথিবী যে গাভী, তাহা প্রসিদ্ধ : কালিদাসের 'দুদোহ গাং স যজ্ঞায়', এবং 'দুদোহ গো-রূপ-ধরামিবোর্ব্বীম্' মনে করুন। বাগ্‌দেবীও যে গাভীরূপিণী, তাহা বহুদিন হইতে স্বীকৃত হইতেছে। চলিত ভাষাতেই গো-শব্দে বাক্য বুঝায়। সোম যজ্ঞে একটী গাভী দিয়া সোম কিনিতে হয়, আগেই বলিয়াছি। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবী। বৃহদারণ্যকে বলিতেছেন—"বাচং ধেনুম্ উপাসীত। তস্যাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ।"—বাগ্‌দেবতাকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে ; তাঁহার চারিটি স্তন, স্বাহাকার, বষট্‌কার হন্তকার এবং স্বধাকার। স্বহাকার এবং বষট্‌কার দেবগণের উপজীব্য ; হন্তকার মনুষ্যের এবং স্বধাকার পিতৃগণের। প্রাণ তাহার পক্ষে বৃষস্থানীয় এবং মন বৎসস্থানীয়। বাগ্‌দেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই গাভী আমাদের ভগবতী হইয়াছেন। স্বয়ং বাক্‌পতি গো-পতি বা গো-পালরূপে গো-গোপ-সংঘাবৃত হইয়া গো-লোক বা বাঙ্‌ময় বিশ্বভুবন জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্থানান্তরে ইহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আপনারা দেখিলেন, এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বময়ী। বেদপন্থী ইঁহাকে ভুলিতে বা ছাড়িতে পারেন না। আরও উচ্চে উঠিয়া আমাদের -শাস্ত্র প্রায় একবাক্যে বলিতেছেন, 'বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম'—বাক্‌ই ব্রহ্ম —"The word is God." পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এখানেই একটু খট্‌কায় পড়িয়াছেন। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে ব্রহ্মশব্দ ঈশ্বর-

বাচক ; বাক্যকে একবারে অনাদি নিত্য ঈশ্বরে পরিণত করা অগ্রীষ্টানের পক্ষেও সম্ভব, ইহা মনে করিতেই বোধ করি গ্রীষ্টান পণ্ডিতদের খট্‌কা লাগে। ঐ পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের মন্ত্র মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্মণ মধ্যে ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্যই বুঝায়, স্পষ্টরূপে ঈশ্বর বুঝায় না। সুসমাচার-প্রচারক জোহনের এত পূর্ব্বে ব্রহ্মনামক বাক্যকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে পরিণত করা হইয়াছে, ইহা মনে করিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। ফলে কিন্তু বাক্‌ই যে ঈশ্বর, শব্দই যে ব্রহ্ম, ইহা বেদপন্থীর পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত পুরাতন কথা। হীরাক্লিটসের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদপন্থীর নিকট ইহা অত্যন্ত পরিচিত কথা। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ইতিহাসটা ব্যাপিয়া, অন্ততঃ ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডল সঙ্কলনের পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত, এই তত্ত্ব বেদপন্থীর অধ্যাত্ম জীবনকে নিয়মিত করিয়া আছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রধান দেবতা প্রজাপতি ; কিন্তু মন্ত্র-সংহিতার মধ্যে প্রজাপতির তেমন প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে চারিবার মাত্র প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ সংহিতায় কিন্তু আর একটি দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম বৃহস্পতি—নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি—ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদবাক্যের পতি। উত্তরকালে ইঁহার নাম হইয়াছে বাচস্পতি। তাহাতে বুঝাইল যে বাক্ বা বেদবাক্যই ব্রহ্ম। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে, তাহাতে বৃহস্পতি স্বয়ং বলিতেছেন, যেন অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন, এই যে বাক্, যাহা সৃষ্ট পদার্থের নামকরণে প্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহা কোন গুহার মধ্যে নিহিত ছিল! কোন্ প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল? "উত ত্বঃ পশ্যন্ অদদর্শ বাচম্, উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্"—লোকে ইহাকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। "উতো তু অস্মৈ তন্বং বিসস্রে, জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ"—পত্নী যেমন শোভন বাস পরিয়া পতির নিকট

যায়, ইনিও তেমনি প্রেমভরে নিজের দেহ প্রকাশ করেন। বৃহস্পতি স্বয়ং বাকের পতি, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভাষাই সমুচিত। এই যে বাক্, ইহা বিশেষতঃ বেদবিদ্যা। বৃহস্পতিই বলিতেছেন—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তেপুপুষ্বান্, গায়ত্রং যো গায়তি শক্করীষু, ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ"—এই বাক্ হোতার মুখে ঋক্‌রূপে বাহির হইয়া যজ্ঞকে পুষ্ট করেন ; উদ্গাতার মুখে শক্করী সামরূপে গীত হন ; অধ্বর্য্যুর মুখে যজুর্মন্ত্ররূপে যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন ; ব্রহ্মা এই বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করেন। অতএব এই 'বাক্' অর্থে বিশেষতঃ বেদবাক্যকেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের ভাষায় এই বেদবাক্য "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" অর্থাৎ সেই মহাভূত ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় প্রজাপতি প্রজারূপে বহু হইবার কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মরূপ ত্রয়ী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদবাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে প্রথমে সমীরিত হইয়াছিল, বেদপন্থী ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বলা হইয়াছে, "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা"—স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইলেও এই বাক্ নিত্য ; ইহাঁর আদিও নাই, নিধনও নাই। খ্রীষ্টানদিগের জনকেশ্বর হইতে উৎপন্ন তনয়েশ্বরের—খ্রীষ্টের বা শব্দরূপী ঈশ্বরের—নিত্যত্বের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়াছেন ; পরন্তু বলিয়াছেন, "যো বেদেভ্যো-ঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে"—যিনি বেদবাক্য দ্বারা অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানেরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শব্দরূপী পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারায় সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদপন্থীও বলেন, শব্দ হইতেই সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ কোনরূপ শরীরধারী দেবতা মানেন না, চলিত অর্থে ঈশ্বরও মানেন না। অথচ

তাঁহারা এই বেদবাক্যকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদবাক্য মূর্ত্তিহীন শব্দরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছেন; এই শব্দ ঋষিদিগকে দেখা দেন এবং মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঋষিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। বেদবাক্যই বাগ্‌দেবতা বা ব্রহ্ম। বেদমন্ত্রের সারভূত যে গায়ত্রী মন্ত্র, উহাকেই বিশেষতঃ বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম; এই ছন্দ সুপর্ণীরূপ ধরিয়া সোম বা অমরতা আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ছন্দের মধ্যে প্রধান, :তিনি "ছন্দসাং মাতা"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমরা প্রাত্যহিক সন্ধ্যোপাসনার সময়ে "আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং, গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ" এই মন্ত্রে গায়ত্রীকে 'ছন্দসাং মাতা' এবং ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া আবাহন করিয়া থাকি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ জোরের সহিত বলিতেছেন, 'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ; বাগ্ বৈ গায়ত্রী, বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ"—সমস্ত ভূত যাহা কিছু বিদ্যমান, এ সমস্তই গায়ত্রী; গায়ত্রীই বাক্, বাক্ই সমস্ত ভূত; গায়ত্রীই বাক্‌রূপে সকল ভূতের নাম দেন এবং সকলকেই রক্ষা করেন। গায়ত্রী ছন্দের যে মন্ত্রটিকে আমরা বেদবাক্যের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, এইজন্য উহাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয়। এই জন্য গায়ত্রীর নামান্তর সাবিত্রী। বিশ্বামিত্র ঋষি উহা প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তদবধি আজি পর্য্যন্ত উহাই বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক বালক উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তদবধি যাবজ্জীবন এই মন্ত্রের জপে বাধ্য থাকে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"স যামেব অমূং সাবিত্রীম্ অন্বাহ এব এষ সা'—সেই আচার্য্য বালককে যে সাবিত্রী মন্ত্র দান করেন, সেই সাবিত্রী মন্ত্রই বিশেষতঃ গায়ত্রী। "এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা"—এই গায়ত্রী

আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই গায়ত্রীতে সমস্ত জগৎই প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণের উপাখ্যান ঋক্‌সংহিতা মধ্যে পুনঃ পুনঃ আছে। উহার গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, বিষ্ণুর তিন পদ এই লোকত্রয়কে বা সমস্ত প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্যাপিয়া আছে, এই তাৎপর্য্য এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই তিন পদ ব্যতীত বিষ্ণুর আর একটি চতুর্থ পদের বা পরম পদের কথা ভূয়োভূয়ঃ শুনা যায়, যে পদ পরম ব্যোমে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত, লোকে বিদ্যমান। এইরূপে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু চতুষ্পদ। গায়ত্রী ছন্দের কিন্তু তিনটি মাত্র চরণ ; গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপ দৃঢ় করিবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, ভূমি, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক ইহাই গায়ত্রীর প্রথম পদ, ঋক্, যজুঃ, সাম ইহাই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ, প্রাণ, অপান, ব্যান ইহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ ; কিন্তু ইহার উপরেও আর একটি তুরীয় বা চতুর্থ পদ আছে, যাহা "পরোরজা" অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত।

এই বাগ্‌দেবতার ব্রহ্মস্বরূপত্ব সম্বন্ধে যদি এখনও আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডল হইতে একটি সূক্ত আপনাদিগকে আমি শুনাইতে চাহি। এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। আজি পর্য্যন্ত শরৎ কালের দেবীপূজায় উহা আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা ঐ সূক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সূক্তের ঋষির নাম বাক্। তিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, খ্রীষ্টের সুসমাচার-প্রচারক জোহনের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি হীরাক্লিটাসের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, তিনি আপনাকে বাক্ অথবা শব্দ-ব্রহ্মরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের এই পুরাতনী ঋষিকন্যা বাক্ জোরের সহিত বলিতেছেন—

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি,

অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ,

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি,
অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা,—

আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; মিত্র এবং বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি; ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও, আমি ধরিয়া রাখিয়াছি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি;
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ,
অহং জনায় সমদং কৃণোমি,
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ,—

আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি, আমিই দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্,
মম যোনিরপ্স্ব অন্তঃ সমুদ্রে,
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা,
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি,—

আমি ঊর্দ্ধভাগে পিতা দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি; দ্যুলোক-কেও আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি।

অহম্ এব বাত ইব প্রবামি,
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা,
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা,
এতাবতী মহিমা সম্বভূব,—

বিশ্বভুবন-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই;

পৃথিবীর পরে, দ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আমি আমার মহিমাদ্বারা সম্ভূত হই।

ইহার চেয়ে জোরের ভাষা হইতে পারে না; ইহার চেয়ে স্পষ্ট কথা হইতে পারে না। মেরীগর্ভে জীবরূপে অবতীর্ণ শব্দরূপী খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। তাহার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে অম্ভৃণ-কন্যারূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, আমিই বিশ্বভুবনের নির্ম্মাণকর্ত্রী—অহং ব্রহ্মাস্মি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে দার্শনিক অদ্বৈতবাদ খুঁজিয়া পান নাই; এই সূক্তটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে।

ইড়াদেবীকে আপনারা চিনিলেন। ইনি বেদপন্থীর সনাতনী বাগ্‌দেবী। শ্রৌতকর্ম্মের সহিত ইড়াভক্ষণ এখন অপ্রচলিত; ইড়াভক্ষণে ইড়াদেবীকে—বাগ্‌দেবীকে—ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করা হইত। ইড়া সর্ব্বদেবময়ী; সকল যজ্ঞেই ইড়াভক্ষণ বিহিত ছিল। যজ্ঞান্তে যজমান বিষ্ণুপদ পাইতেন। ইড়াদেবীর নাম পর্য্যন্ত আপনারা ভুলিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌দেবীকে বেদপন্থী ভুলিতে পারেন না। তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া বেদপন্থীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদপন্থীকে আমি মোটের উপর nominalist বলিয়া জানি। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, দেবতার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর নাই; কোন রূপ নাই। যে কোন পদার্থের, যে কোন concept-এর বা ideaর একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে, সেই পদার্থই দেবতা। যাহা কিছু object of thought, তাহাই দেবতা। যে বাক্যে সেই conceptএর তাৎপর্য্য বা connotation পাওয়া যায়, সেই বাক্যই—সেই predicationই,—দেবতার মন্ত্র; অতএব দেবতা মন্ত্রাত্মক। ইহা চূড়ান্ত nominalism, জগতে যাহা কিছু মননযোগ্য বা object of thought আছে বা থাকিতে পারে, তাহাই দেবতা এবং যে দেবতাকে

যে নাম দেওয়া যায়, সেই নামই সেই দেবতার শরীর। এই অর্থে দেবতামাত্রই শব্দময়ী, বর্ণময়ী। যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা দেবতার নামকেই দেবতার তুল্যমূল্য ধরিয়া লইয়াছেন। এমন কি, সত্যভামা ঠাকুরাণী তুলাদণ্ডে তাঁহার হরির মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়িলে, রুক্মিণী তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, হরির চেয়ে হরির নামের গুরুত্ব অধিক। বেদপন্থীর এই nominalism শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারে চরম সার্থকতা পাইয়াছে। ওঁ এই একাক্ষর শব্দটার প্রাচীন অর্থ—হাঁ; আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইত, ওঁ অর্থাৎ হাঁ,—আছে। ব্রহ্ম আছেন এ বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ ছিল না, তাঁহারা এই ওঁ অক্ষরটিকেই ব্রহ্মের সব চেয়ে ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই জন্য ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি। তন্ত্রপন্থী দার্শনিক ও বেদপন্থীর এই nominalism গ্রহণ করিয়াছেন। ওঙ্কারের অনুকরণে তিনিও $x$, $y$, $z$, বা ক খ গ বা হিং টিং ছট্ ইত্যাদি অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নাম বা বীজমন্ত্র দ্বারা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নামের সুবিধা এই যে, সাধক নিজের স্বভাব ও মেজাজ অনুসারে যে কোন সঙ্কেতে যে কোন সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য্য আরোপ করিতে পারেন—আপনার মনের মত করিয়া আপনার দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্ত হন না। তন্ত্রপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক; তিনি প্রত্যেক নামকে একটা রূপ দিয়া realise করিতে চাহেন, রূপের জগতে টানিয়া আনিয়া দেবতার সহিত মেলা মেশা কার-বার করিয়া রসসম্ভোগ করিতে চাহেন। তিনি এখানে আর্টিষ্ট। প্রত্যেক নামের, প্রত্যেক দেবতার, তিনি একটা রূপ কল্পনা করিয়াছেন; সেই নামের যে তাৎপর্য্য বা connotation তিনি দিতে চাহেন, তদনুযায়ী রূপ কল্পনা করিয়াছেন। সেইরূপ ধ্যান করিয়া তিনি তৃপ্তি পান। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ঝগড়ায় কোন লাভ নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীর বাগ্‌দেবীকে

শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তন্ত্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাত্মিকা—অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে ইঁহার দেহ নির্ম্মিত; প্রতি অঙ্গে কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষর বসাইয়া ইহাঁর শব্দময়—বর্ণময়—দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে—অতএব ইনি পঞ্চাশল্লিপিভিবিভক্তমুখদোঃ-পন্মধ্য-বক্ষঃস্থলা। ইনি ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা—ইঁহার মস্তকে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। এ সেই সোমকলা, বাগ্‌দেবী স্বয়ং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা, এক হাতে অক্ষমালা, এক হাতে বিদ্যা, চতুর্থ হাতে সুধাঢ্য কলস,—অমৃতপূর্ণ কলস—ইহাও সেই সোমকলস, যাহা অমৃতরসে পূর্ণ। ইনি ত্রিনয়না—বিশদ-প্রভা—আপীনতুঙ্গস্তনী। এমন রূপ আর হয় না। এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বময়ী;—যে কোন দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পূজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন—আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিন্যাস করিয়া আপনার স্থূল দেহকে বাগ্‌দেবতার বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন; আপনার অন্তঃশরীরেরও চক্রে চক্রে ঐরূপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দেহকেও বাগ্‌দেবীর বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। তন্ত্রমতে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। বাহিরের দেহে ও অন্তর্দেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগ্‌দেবীর শব্দময় বাঙ্‌ময় দেহ রচনার নামই মাতৃকা ন্যাস। এইরূপে পূজায় বসিলে পূজকের সহিত বাগ্‌দেবতার অভিন্নতা কল্পিত হয়; জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য কল্পিত হয়। বৈদিক যজ্ঞে ইড়া-ভক্ষণের অভিপ্রায় যজমানের সহিত বাগ্‌দেবতার—শব্দব্রহ্মের—ঐক্য সম্পাদন। তান্ত্রিক পূজারও সেই একই অভিপ্রায়। খ্রীষ্টান তাঁহার বাগ্‌দেবতাকে গ্রীকদের নিকট ধার করিয়া লইয়াছেন; তাঁহাকে মূর্ত্তি দিয়া খ্রীষ্ট বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই শব্দব্রহ্মতত্ত্বকে অধিকদূর ফলাইতে পারেন নাই। বেদপন্থী যাহা ধরেন, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন।

এতক্ষণে আপনারা ইড়াভক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। হাসিবেন না, ইড়াভক্ষণ খ্রীষ্টানের দেবতা-ভক্ষণের অনুরূপ অনুষ্ঠান। ইড়াভক্ষণে বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্‌দেবতার সহিত সাযুজ্য স্থাপন হয়, অমৃত-ভোজন ঘটে। সোমপানেও যে ফল, ইড়া-ভক্ষণেও সেই ফল। ইড়া-ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না— ইড়াভক্ষণেই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। পুরাকালে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কতটা স্থান জুড়িয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে আমি এ পর্য্যন্ত খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু এখন খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে কথায় কথায় যজ্ঞ সম্বন্ধে উপাখ্যান দেখিবেন। সকলেই যজ্ঞ করিতেছে। রাজারা করিতেছেন, ঋষিরা করিতেছেন, অঙ্গিরোগণ করিতেছেন, আদিত্যগণ করিতেছেন, পিতৃগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ, সকলেই যজ্ঞ করিতেছেন। এমন কি গাভীগণ ও বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিতেছে। যজ্ঞ লইয়া দেবগণের সহিত অসুরগণের কেবলই বিবাদ হইতেছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ অসুরগণকে পরাজয় করিতেছেন। দেবতারা যজ্ঞকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যজ্ঞ আপনি আসিয়া ধরা দিতেছেন; দেবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিতেছেন। মনু যজ্ঞ করিয়া লুপ্ত মানববংশ রক্ষা করিতেছেন। সংবৎসররূপী অর্থাৎ কালরূপী প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছেন; ঋতুগণ ও মাসগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছেন। প্রজাপতির ইচ্ছা হইল, আমি একা আছি, বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া আপনার প্রাণের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখিতে পাইলেন। সেই দ্বাদশাহ যজ্ঞকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সেই যজ্ঞ করিলেন; তাহাতেই তিনি বহু হইলেন ও প্রজাপতি হইলেন। দেখাদেখি ইন্দ্র দ্বাদশাহ যজ্ঞ করিলেন; তাহাতে তিনি দেবগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রজাপতি এককালে গৃহপতি

হইয়াছিলেন; দেবগণও যজমান হইয়া প্রজাপতির সহিত একযোগে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহাদের চিত্তি স্রুক্ হইয়াছিল, চিত্ত আজ্য হইয়াছিল, বাক্য বেদি হইয়াছিল, ধ্যান বর্হিঃ বা কুশ হইয়াছিল, জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল, বিজ্ঞান অগ্নীৎ হইয়াছিল, প্রাণ হব্য হইয়াছিল, সাম অধ্বর্য্যু হইয়াছিল, বাচস্পতি হোতা হইয়াছিলেন, মন মৈত্রাবরুণ হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ। স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন। মনে রাখিবেন, যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট্ পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন। কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছিলেন? যজ্ঞদেবতার উদ্দেশেই আহুতি দিয়াছিলেন। প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞদেবতা, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁহার কোন ইষ্টলাভ থাকিতে পারে না; তিনি সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা লীলা-কৈবল্য। আপনারা বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের কথা শুনিয়াছেন—সেই পুরুষ সূক্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুষ্ঠিত এই আদিম যজ্ঞের—এই পুরুষ-যজ্ঞের—সবিশেষ বিবরণ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন পুরুষ—এক জন Person, যাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে, কামনা মাত্রে তপস্যা মাত্রে, এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে পুরুষ, তাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি, সহস্র পদ। বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন এবং তাহার উপরেও আরও দশ অঙ্গুলি ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্বভূত তাঁহার একপদ মাত্র, তাঁহার অন্য তিন পদ বিশ্বভূত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। যাহা কিছু আছে, যাহা ছিল বা হইবে, তাহা লইয়াই এই পুরুষ। অথচ এই সমস্তই তাঁহার এক পদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি বিরাট্‌রূপে জন্মিয়া আত্মপ্রকাশ

করিলেন; এবং জাত হইয়াই সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমস্তকে আক্রমণ করিলেন, এবং অতিক্রম করিয়া রহিলেন। তিনিই অগ্রজন্মা পুরুষ; তখন কোথাও কোন দেবতা ছিল না, ঋষি ছিল না, মনুষ্য ছিল না, অথচ সেই ভাবী পুরুষেরা কোথা হইতে আসিয়া সেই অগ্রজন্মা বিরাট্ পুরুষকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে চমকাইবেন না; সৃষ্টিঘটনা কালাতিগ ঘটনা; এখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত মিশিয়া থাকে। যজ্ঞে পশু আবশ্যক; সেই পুরুষকেই তাঁহারা পশু করিলেন। "তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ, তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে"—ঋষিগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ সেই অগ্রে জাত পুরুষকেই পশুরূপে প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। "দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্"—দেবগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই পুরুষকেই পশুরূপে বন্ধন করিলেন। সেই যজ্ঞ সর্ব্বহুত যজ্ঞ। যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই সেই পুরুষ; সেই সর্ব্বরূপ পুরুষকেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল; সেই পশুকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুতি দেওয়া হইল। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্রাগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে জন্মিল। আরণ্য এবং গ্রাম্য পশুগণও উৎপন্ন হইল। ভাবী জীবগণের হিতার্থে বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—আপনাকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন;—ভাবী জীবেরা, ভাবী দেবগণ ও ভাবী ঋষিগণ, যজমান ও ঋত্বিক্ হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে তাঁহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞের সম্পাদন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যজ্ঞের কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবেন। ইহাই বিশ্বমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞ; কেবল যজ্ঞের জন্যই, অন্য কামনা বর্জ্জন করিয়া কেবল যজ্ঞের জন্যই, এই প্রথম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মাণি

প্রথমান্যাসন্”—এখন যে যজ্ঞ করা হয়, সে সেই আদিম যজ্ঞেরই অনুকরণে।

বিরাট্ পুরুষের এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে, “কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্”—এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ কি ছিল, প্রতিমা কি ছিল, উহার সঙ্কল্প কি ছিল? “আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থম্; যদ্ দেবা দেবম্ অযজন্তঃ বিশ্বে”—বিশ্বমধ্যে দেবতারা যজ্ঞ পুরুষের যে যাগ করিয়াছিলেন, তাহার আজ্য কি ছিল, পরিধি কি ছিল, ছন্দ কি ছিল, শস্ত্রই বা কি ছিল? বলা হইতেছে, “যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভি স্তত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ”—বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে। “ইমে বয়ন্তি পিতরো আ যজুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে”—সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া সেই বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। “চা কৢপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যাঃ, যজ্ঞে যাতে পিতরো নঃ পুরাণে”—সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ, মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। “পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষসা তান্, য ইমং যজ্ঞম্ অযজন্ত পূর্ব্বে”—পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এখনও যেন মানসচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতই এই সৃষ্টি-যজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্‌পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি

দিয়াছেন। সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞিয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্ঞিয় পশুর দেহ; যাবতীয় জীবের হিতার্থ ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে—অন্নরূপে—নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ করিয়া সেই বিরাট্‌পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট্ পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন; অথচ তিনি নষ্ট—নিহত—হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার। বেদপন্থী সমাজে অগ্নিচয়ন বলিয়া একটা সংবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখাত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে একটি বেদি গাঁথা হইত, তাহার নাম চিতি। ইটের পাশে ইট বসাইয়া, ইটের উপর ইট থাকে থাকে সাজাইয়া এই চিতি নির্ম্মিত হইত। তজ্জন্য বহু ইষ্টকের প্রয়োজন হইত। এই চিতির মধ্যস্থলে উত্তর বেদি গড়িয়া সেখানে অগ্নির স্থাপনা হইত; এবং সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। কোথাও বা সংবৎসর ধরিয়া সত্ররূপে অগ্নিচয়নের অনুষ্ঠান হইত। অনুষ্ঠান-ভেদে এই অগ্নি নানাবিধ নাম পাইত। কোথাও নাম সাবিত্র অগ্নি; কোথাও বৈশ্বসৃজ অগ্নি; কোথাও বা চাতুর্হোত্র অগ্নি; কোথাও নাম নাচিকেত অগ্নি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে অন্য অগ্নির সহিত নাচিকেত অগ্নির চয়নের বিস্তৃত বিবরণ আছে। নাচিকেত অগ্নির প্রসঙ্গ আপনারা কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদ মধ্যে পাইয়াছেন।

মৃত্যু নচিকেতাকে এই অগ্নিচয়নে ইষ্টকের সংখ্যা ও ইষ্টকস্থাপনের প্রণালী এবং অগ্নির তাৎপর্য্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার নামেই এই অগ্নির নাম হইবে; যে তিন বার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিবে, সে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিবে ও পরম শান্তিলাভ করিবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেই উপাখ্যানটির উল্লেখ আছে। আর এক অগ্নির নাম আরুণ-কেতুক অগ্নি—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের আরম্ভেই ইহার সবিস্তর বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। উত্তর বেদির স্থানে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালা হইত; তাহার উপর পদ্মের ডাঁটা, পদ্মফুল বিছাইয়া একখানা পদ্মপত্রে সোণার পাতের উপরে সোণার পুরুষ মূর্ত্তি রাখা হইত; তাহার পার্শ্বে একটা কূর্ম্ম—কাছিম—রাখা হইত। অতঃপর সেখানে অগ্নি রাখিয়া অগ্নির চারিদিকে ইট সজাইয়া চিতি প্রস্তুত হইত। এই অগ্নির নাম আরুণকেতুক অগ্নি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জলময় ছিল। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে বিখ্যাত নাসদাসীয় সূক্তে এই জলের কথা আছে—"তম-আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে, অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্;" সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল, আমি সৃষ্টি করিব। এখানেও তৈত্তিরীয় আরণ্যক নাসদাসীয় সূক্তের দোহাই দিয়া বলিতেছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—অগ্রে কাম উৎপন্ন হইল, উহা মন হইতে বীজরূপে প্রথমে জন্মিল। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি কামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজা-পতির মানসপুত্র মনসিজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ, প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন। সে কথা যাক্। সৃষ্টি কামনা করিয়া প্রজাপতি তপস্যা করিলেন ও আপনার শরীর কম্পন করিলেন। শরীর হইতে কতকগুলি ঋষি জন্মিল—একদল ঋষির নাম অরুণকেতু।

প্রজাপতি দেখিলেন, জলমধ্যে একটি কূর্ম্ম—কচ্ছপ—চরিতেছে। প্রজাপতি সেই কূর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখনই জন্মিলে? কূর্ম্ম বলিল, না, আমি আগে হইতেই আছি; এই বলিয়া কূর্ম্ম সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ পুরুষের মূর্ত্তি ধরিল। এই তিনটি বিশেষণেই আপনারা ইহাকে চিনিতে পারিবেন; ইনিই পুরুষসূক্তের বিরাট্ পুরুষ। এইখানে নারায়ণের কূর্ম্মাবতারের মূলও পাইবেন। প্রজাপতি বলিলেন, তাহা হইলে তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর। তখন সেই পুরুষ অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া এদিকে ওদিকে ছিটাইতে লাগিলেন। এক এক দিকে এক এক দেবতা জন্মিল—আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা জন্মিল। সেই জলের বিন্দু হইতে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মিল। ফলে ঐ যে কূর্ম্মরূপী পুরুষ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতির মধ্যেই ছিলেন, প্রজাপতির সৃষ্টিকামনার পর তিনি বাহিরে আসিলেন মাত্র। প্রজাপতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপসংহারে বলিতেছেন—বিধায় ভূতানি বিধায় লোকান্, বিধায় সর্ব্বান্ প্রদিশো দিশশ্চ, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য, আত্মনা আত্মানম্ অভি সংবিবেশ—সত্যস্বরূপ অগ্রজন্মা প্রজাপতি ভূতসকল ও লোকসকল বিধান করিয়া দিক্ বিদিকের সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইংরেজিতে বলিলে তিনি বিশ্বজগৎকে transcend করিয়াও তাহাতে immanent রহিলেন।

আরুণকেতুক নামক অগ্নিচয়নের অনুষ্ঠান প্রজাপতি কর্ত্তৃক সেই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের অনুকরণ। উত্তর বেদির নীচে যে জল ঢালা হয়, উহাই সেই সৃষ্টির পূর্ব্বতন কারণ সলিল; পদ্মপত্রস্থ বা সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট হিরণ্ময়বপুঃ পুরুষ কারণসলিলশায়ী নারায়ণ; পার্শ্বে কাছিমটি কূর্ম্মরূপী বিরাট্ পুরুষ। এই বিরাট্ পুরুষ স্বদেহ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠিত পুরুষ-যজ্ঞ। চিতির মধ্যে উত্তর

বেদিতে যে অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ অগ্নিই প্রজাপতির তৈজস রূপ; বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনি জগতের যাবতীয় কর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন। অগ্নির চারিদিকে ইট বসাইয়া যে চিতি নির্ম্মিত হয়, তাহা প্রজাপতির স্থূল দেহ—বিশ্বজগৎরূপ স্থূল দেহ; ইষ্টকগুলি সেই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—কূর্ম্মপুরুষনিক্ষিপ্ত কারণসলিলের বিন্দু হইতে উৎপন্ন জাগতিক লোকসকল বা ভূতসকল। অরুণকেতু ঋষিগণের নামানুসারে ঐ অগ্নির নাম আরুণ-কেতুক অগ্নি। ঐ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে পুরুষ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ এই অগ্নিচয়নের থিয়োরি আরও ফলাইয়াছেন। ঐ অগ্নি বৈশ্বানর অগ্নি—জগতের যাবতীয় কর্ম্মের বা যাবতীয় ঘটনার প্রেরক। ঐ চিতি প্রজাপতির স্থূল দেহ—উহা প্রজাপতির দেহ বটে; শতপথ বলেন, উহা যজমানের দেহও বটে—কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। উহা আবার সংবৎসরের দেহ, অতএব কালস্বরূপ; প্রজাপতিই সংবৎসর, সংবৎসরই কাল। অগ্নিচয়নানুষ্ঠান সংবৎসর ধরিয়া চলে। প্রজাপতির সৃষ্টিকর্ম্ম কাল ব্যাপিয়া চলিতেছে; উহার আদি নাই, অন্ত নাই। চিতিটিকে শ্যেন-পাখীর আকার দেওয়া হইত। এই শ্যেন পাখী ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে সমর্থ; আপনাদের মনে থাকিবে, এই শ্যেন পাখী একদা কোন্ ঊর্দ্ধলোক হইতে সোমরূপী অমৃত আনয়ন করিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছেন, চিতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই যে অগ্নি, ইনি জগৎ-কর্ম্মের প্রেরক বৈশ্বানর অগ্নি; ইনিই প্রজাপতির স্বরূপ। শতপথ বলেন, ইনি আবার যজমানেরও স্বরূপ; কেন না যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। ইহাতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতির আত্মাহুতি; তাহা জীবনযজ্ঞে যজমানেরও আত্মাহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই আত্মাহুতিকে আমরা মৃত্যু বলি; এই আহুতির বিরাম বা অন্ত নাই; মৃত্যুরও বিরাম বা অন্ত নাই। প্রজাপতি আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন;

যজমানও আপনাকে ত্যাগদ্বারা নিহত করিতেছেন। প্রজাপতি মৃত্যু-স্বরূপ; যজমানও মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুর অন্ত নাই, কেন না এই মৃত্যু দ্বারাই অমরতা পাওয়া যায়। প্রজাপতি মৃত্যুঞ্জয়—যজমানও মৃত্যুঞ্জয়ী। খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রসঙ্গ আবার মনে করিবেন।

বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞের স্থান আমি আপনাদিগকে দেখাইতে চাহি। ইষ্টি যাগাদি যজ্ঞ বটে; ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রাচীনতর কালের অনুষ্ঠান; আরও প্রাচীন কালের survival. ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল অনুষ্ঠান সমাজে চলিত হইয়াছিল—যাজ্ঞিকেরা উহাতে নূতন তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগকে সেই নূতন তাৎপর্য্যই মানিতে হইবে; এবং এই তাৎপর্য্য অনুসারে যজ্ঞকে খুব ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। ইহা টাইলার সাহেবও মানিয়াছেন। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম—ঋগ্‌মন্ত্র প্রচারের সময়েও কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম। খ্রীষ্ট-যজ্ঞের সহিত পুরুষ-যজ্ঞের সাদৃশ্য তুলনা করিবেন। ওয়েবারের মত বিদেশী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশী খ্রীষ্টান এই সাদৃশ্য কতকটা দেখিয়া চমকাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ব্যাপকতা দেখিতে পান নাই। খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্ঞের পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন—সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ-ভক্ষণে ইতর জীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে। খ্রীষ্টান এই একত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র; তাহার অধিক কিছু নহে। বেদপন্থীর মতে পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন; এই সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, যিনি বড় তিনি ছোট হইয়াছেন, যিনি অমৃত তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না, যে সে নিজে সেই ঈশ্বর হইতে

অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর—তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই; অতএব সে চিরমুক্ত; অথচ তাহাকে বদ্ধ সাজিয়া সংসার-যাত্রা চালাইতে হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্যু স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন ব্যাপিয়া পশুর মত যূপবদ্ধ থাকিয়া পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্, যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্, অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্ বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনম্,—মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চরম পরমায়ু একশ ষোল বৎসর ধরিলে প্রথম চব্বিশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মধ্যের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে করা যাইতে পারে। আবার বলা হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান ভোজন করে, তাহাই এ যজ্ঞে দীক্ষা; বাল্যে যে খেলাধূলা করে, তাহাই উপসদ্; যৌবনে যে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ; আর বার্দ্ধক্যে যে তপস্যাদি করে, তাহাই দক্ষিণা; পরিশেষে মৃত্যুই তাহার অবভৃথ স্নান। ছান্দোগ্য বলেন, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে মানবজীবন সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—"অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি প্রাণসংহিতমসি"—অহে সূক্ষ্ম প্রাণধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তর কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এই দেবকী-নন্দন কৃষ্ণটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্লবিত করিয়া গীতাশাস্ত্ররূপে তাঁহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একালের অনেক পণ্ডিতে বলেন, যজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই আধুনিক কালে উপনিষদের এবং গীতাশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এ সব বাজে কথায়

আপনারা কাণ দিবেন না। ঋগ্‌মন্ত্রের প্রচার কালেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য কতটা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমি উপস্থাপিত করিয়াছি—সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা সমর্থন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন মর্ম্মগত বিরোধ নাই; আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।

এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতামধ্যেই বলিয়াছেন—"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতেই তোমাদের কামনার পূরণ হইবে। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"—যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষ রূপে সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্"—যজ্ঞের যাহা হবিঃশেষ, তাহাই অমৃত; সেই অমৃতভোজনে সনাতন ব্রহ্মলাভ হয়। অধিক কি বলিব, "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞ? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্ম্মার পুরুষ-যজ্ঞ, অন্য পক্ষে ইহা ইতর মানবের জীবন-যজ্ঞ; একটা অন্যটারই প্রকারভেদ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ঘোর আঙ্গিরসেরও এই উপদেশ—তাঁহার ক্ষত্রিয় শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও এই উপদেশ। উপনিষদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরম তৃপ্তি পান, তাঁহারা এখানে অবধান করিবেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন, "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—যে কর্ম্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তপস্যা, তোমার পূজা, তোমার পানভোজন পর্য্যন্ত তুমি যজ্ঞরূপে আমার উদ্দেশে অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তন্ত্রপন্থীও

এই বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, 'যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্''। মনে রাখিবেন যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান। যজ্ঞ নানাবিধ—"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ"—কাহারও নিকট দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ, কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনই কাহারও নিকট যজ্ঞ। কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপরসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন; আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ। কে কাহার উদ্দেশে কোন্ দ্রব্য আহুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলিতেছেন—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা"—এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম; ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিক্ সাজিয়া আহুতি দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্ম-সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে।

জীবনের কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ; ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই হবিঃশেষ-ভোজন, অতএব অমৃতভোজন; "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উচু হইয়া পড়ে—নীচের পরদা হইতে উঠিয়া অত্যন্ত উচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই—বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই—এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবন-যজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরিয়া আছি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন। মনুষ্য

জন্মমাত্রেই কয়েকটা ঋণে বদ্ধ হইয়া জন্মে, ইহা মানব-জন্মসম্বন্ধে অতি প্রাচীন থিয়োরি। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে।" উত্তরকালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্য-বিধাতা ; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন ; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে ; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে ; পশু পাখী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার জীবন-রক্ষার সাহায্য করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া জীবনযাত্রাটা দুষ্কর্ম্ম। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণ-শোধের চেষ্টা করিতে হইবে। এক একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডুষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্য যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুঃ, সাম, বা, তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্ততঃ একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই ; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞকয়টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণস্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ-স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, "পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে"—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি দেবযজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট culture এর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাঁহারা ঋষি হইলেন। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়া-

ছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ-সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋগ্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতে-ছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।" এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় খোদাই করিয়া রাখা উচিত।

মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন—মানুষ অন্য পশুর মত খায়, লাফায় ও ঘুমায়, এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করে। আপাততঃ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনরক্ষা—পরের জীবন নষ্ট করিয়া আপন জীবনের রক্ষা। প্রাণিবিদ্যা বা biology বিদ্যামতে মানবজীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ জীবনে কোন রস নাই, কোন গৌরব নাই। মানবজীবনকে পশু-জীবনের উপরে রাখিতে হইলে জীবনে সম্পূর্ণ উল্টা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম্মকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের জীবনের সহিত মিলাইয়া সমঞ্জস করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের ভাষায় যে বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বজগতে সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন, সেই অগ্নি মানবের প্রাণকেও জীবনের কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন, মনে করিতে হইবে। এই বৈশ্বানর অগ্নিকেই অগ্নিচয়না-নুষ্ঠানে উত্তর বেদিতে আহরণ করিতে হয়—ইনিই বিরাট্ পুরুষরূপ

প্রজাপতির প্রাণ, অতএব জীবেরও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন, "স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ অগ্নিরুদয়তে"—সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানরই জীবদেহে প্রাণাগ্নিরূপে উদিত হন। ইঁহারই প্রসাদে তুমি "অৎসি অন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্"—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় দর্শন করিতেছ। এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই যাবতীয় জীব অন্নের অন্বেষণে, ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে, ছুটিতেছে; এবং সেই প্রাণাগ্নিতেই সেই অন্নের, সেই ভোগ্য বস্তুর, সমর্পণ করিতেছে। ইহা এক রকম নিত্য অগ্নিহোত্রের ব্যাপার; প্রাণিমাত্রকেই আপন দেহে এই অগ্নিহোত্র অহরহঃ সম্পাদন করিতে হইতেছে। "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রমুপাসতে"—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন স্তন্যের জন্য মাতার নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত এই অগ্নিহোত্রের সমীপে উপস্থিত হয়। বিশ্বরূপ প্রজাপতির দেহ ব্যাপিয়া এই অগ্নি সঞ্চরণ করিতেছেন; প্রাণিদেহের অগ্নিতে অন্নাহুতি হইলে সেই বিশ্বরূপী প্রজাপতির উদ্দেশেই আহুতি হয়। "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে অন্তঃ, ত্বমেব প্রতিজায়সে, তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি, যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি"—অহে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, এবং তুমিই জীবরূপে জন্মগ্রহণ কর; সকল প্রাণ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে; সকল প্রজা তোমার উদ্দেশে বলি আনিয়া উৎসর্গ করিতেছে। প্রাণের ভিতরে নিত্য আকাঙ্ক্ষার ও বাসনার আগুন জ্বলিতেছে, তাহার তৃপ্তি আবশ্যক—ইহা তাহার নিত্য অগ্নিহোত্র। পশুধর্ম্মী মানুষ ক্ষুধানিবারণের জন্য যে অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কেবল একটা biological need মনে করিবেন না। তাহা সেই অগ্নিহোত্রের আহুতি—ইহার নাম প্রাণাগ্নিহোত্র। জীবনরক্ষার জন্য শেয়াল কুকুরের মত অন্নের গ্রাস গিলিয়া গলাধঃকরণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই; কিন্তু ঐ পাশবিক কর্ম্মকে নিত্য সম্পাদ্য অগ্নিহোত্ররূপে দেখিলে উহাতে আর পাশবিকতার

ক্লেদ থাকে না, উহা মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত হয়। ছান্দোগ্য বলিতেছেন, "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ হোমীয়ং, স যাং প্রথমা-মাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি, প্রাণস্তৃপ্যতি"—ভাতের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা হোমদ্রব্য; প্রাণায় স্বাহা বলিয়া সেই ভাতের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হইবে; "সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি"; এইরূপে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা সর্ব্ব লোকে, সর্ব্ব ভূতে, সর্ব্ব আত্মায় আহুতিরূপে অর্পিত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী উপনিষৎ মন্ত্রটিকে আরও স্পষ্ট করিতে চাহেন। অন্নগ্রাস গ্রহণের মন্ত্র হইবে—"প্রাণে নিবিষ্টঃ অমৃতং জুহোমি, প্রাণায় স্বাহা"—আমি প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিতে যে আহুতি দিতেছি, ইহা অমৃতাহুতি; এই যে অন্ন, ইহা অমৃত। প্রাণ অপানাদি পাঁচ প্রাণের উদ্দেশে ঐরূপ পাঁচটি আহুতির পর সমাপ্তিতে, বলা হইবে, "ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়"—আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করুক। অনুষ্ঠানরত গৃহস্থেরা এখনও ভোজনকালে এইরূপে পঞ্চগ্রাস লওয়ার প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। কচিৎ কখনও ইষ্টিযাগ করিয়া ইড়া-ভক্ষণে দরকার কি? প্রত্যহ উদরপূরণের জন্য অন্ন-ভোজনেই আমরা ইড়া-ভক্ষণের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারি। অন্নের প্রত্যেক গ্রাসই ইড়া; অন্ন ভোজনের ব্যাপারটা নিতান্ত উদরপূরণের ব্যাপার মনে না করিয়া উহাকে আমরা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্ঞে বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্পিত হবিঃশেষ-ভক্ষণ মনে করিলে, বিশ্বহিতার্থ নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষযজ্ঞ-সম্পাদনে সমর্থ রাখিবার উপায় রূপে মনে করিলে, কর্ম্মটা পাশবিকতার স্তর হইতে একেবারে মানবিকতার স্তরে উঠিয়া পড়ে।

এ দৃষ্টান্ত একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। আসল কথা এই:—আমার

এই যে জীবন, ইহা বৈশ্বানর অগ্নির চয়নব্যাপার মাত্র। সারা জীবন ধরিয়া ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া আমি পুরুষ-যজ্ঞের চিতি নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই ত পুরুষযজ্ঞ, এ ত বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণ; কেননা বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমান, আমিই ঋত্বিক্ এবং আমিই দেবতা এবং আমার সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ বা আত্মাহুতি। বেদপন্থী এই জীবনযজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন; এত বড় করিয়াছেন যে, পশ্চিমের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদের ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা কৌতূহলী, তাঁহারা Eggeling সাহেবের শতপথ ব্রাহ্মণের এবং Keith সাহেবের তৈত্তিরীয় সংহিতার অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গের ভূমিকা দেখিবেন। জীবনযজ্ঞ পুরুষযজ্ঞেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের ব্যাপার। প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু প্রতি অর্পণ করিতে হইবে; বেদপন্থীর প্রতি তাঁহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—দান ধ্যান হইতে আহার নিদ্রা নাচা কোদা সকল কর্ম্মই কেবল স্বভাব-প্রেরিত জৈব কর্ম্মরূপে না দেখিয়া সেই এক দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। তন্ত্রের ভাষায়, যাহা কিছু করিবে, তাহা জগন্মাতার পূজারূপেই করিবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম পূজারূপে অর্পণ করিলে পূজক খাট হন না, ইহাতে তিনি আপনাকে বড়ই করেন; কেন না পূজামাত্রই আত্মপূজা, পূজক নিজেই নিজের দেবতা। তন্ত্রমতে মানসপূজার স্তবটি স্মরণ করুন,—

> আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ, শরীরং গৃহং,
> পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ,

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ, স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরঃ,
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তৎ তদখিলং শম্ভো তদারাধানম্।

অহে শম্ভু, আমিই তুমি, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। আমার মতিই তোমার পত্নী পার্ব্বতী। আমার প্রাণসকলই তোমার সহচর ভূতগণ; আমার শরীরই তোমার গৃহ। আমি যে বিষয়োপভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, ইহাই তোমার পূজা। আমি যখন নিদ্রা যাই, তখন তোমাতেই সমাধি লাভ করি। পৃথিবীতে পা ফেলিয়া এদিক্ ওদিক্ যে ভ্রমণ করি, ইহাতে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। আমি যে কিছু কথা কহি, তাহা তোমারই স্তব। আমি যে যে কর্ম্ম করি, সে সকল ত তোমারই আরাধনা। দেখিবেন, আঙ্গিরস ঘোর ঋষি দেবকী-নন্দন কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তন্ত্রও তাহারই অন্য ভাষায় পুনরুক্তি করিতেছেন।

আমিই তুমি, এর চেয়ে বড় কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। ফলে আমিই বিশ্বকর্ম্মা; বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণের কাদামাটি আমার হাতেই রহিয়াছে; সেই মশলা দিয়া আমার জগৎ আমার ইচ্ছামত আমি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারি। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" —পৃথিবীর ধূলিকে আমি ইচ্ছামত মধুতে পরিণত করিতে পারি। এই জন্য বেদপন্থী আপনাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি বড় করিয়া দেখেন; প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাকেই খুব বৃহৎ করিয়া দেখিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁহার হাতে যে পরশ পাথর আছে, তাহার স্পর্শে মাটি সোণা হইয়া যায়। নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে তাঁহার সুখ নাই। এই জন্য লৌকিক ব্যবহারেও যে কোন অঙ্কের গায়ে দশ বারটা শূন্য বসাইতে তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। তাঁহার দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্র তাঁহার এই অভ্যাসের —লোকে বলিবে এই কদভ্যাসের—পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে

লোকে এইজন্য হাসে ; কিন্তু তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানেন, এবং জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই সেই পরিমাণে বড় করিয়া দেখেন। আপনারা Individualism বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে এই বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা—নৈসর্গিক প্রবৃত্তির মুখে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে বড় করা—যাবতীয় নিয়মের ও সংযমের, আচারের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; রোমান রাষ্ট্রনীতিমতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্য জীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিম দেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে ; ফলে বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি সকল গার্হস্থ্য বন্ধন পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে, কিন্তু বেদপন্থীর স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে, আমি যত বড়, অন্য কেহ তত বড় নহে—হইতে পারে না। বটেই ত, আমিই ত বিশ্বকর্ম্মা। তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় আমাকে রাখিলে ও অন্য পাল্লায় ব্রহ্মাণ্ডকে রাখিলে আমারই গুরুত্ব অধিক হয়। বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই—পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা—আমার অন্তরের ভিতরে এই যে আমি, সেই আমি পুত্র, বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহাঁর চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দস্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইঁহার সোয়াস্তি হইতে পারে না। এইরূপ

স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে, সকলেই আমার পর, আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই করিতেছে—বাহিরে যে জড়জগৎ ভোগের জন্য বিস্তীর্ণ আছে, তাহাকে টানিয়া ছেঁচিয়া নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত রস নিঃশেষে পান করিবার চেষ্টায় আছে। আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic processএর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার আবর্জ্জনার ক্লেদে জগৎটা পূর্ণ হয়। এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই cosmic processএর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic processকে পরাভূত করিয়া ethical processকে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম। ১৮৯৩ সালের শেলডোনিয়ান থিয়েটারে দাঁড়াইয়া হক্সলী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence." পুনশ্চ, moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process." পুনশ্চ, the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it." চারি বৎসর পরে ঠিক্ সেইখানে দাঁড়াইয়া ঐ cosmic process সম্বন্ধে জন্ মর্লী বলিয়াছিলেন—"Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and

claw, does by system all that good men by system avoid.” প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে; নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিতেছে; ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য-পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে, সে কেবলই না—না—না—না বলিতেছে। মানুষ বিরোধের দ্বারা ভোগের পথে চলিতে গেলেই সেই মানুষটা প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, না—না—না—না, ও পথে না—ও পথে না। ইনিই সেই আসল মানুষ প্রজাপতি, যিনি চরতি গর্ভে অন্তঃ। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বযজ্ঞে আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে জগতে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ এবং ত্যাগের দ্বারা মেলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই—এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি individualism, কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু এই মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বন্ধন আবশ্যক—বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত মেলনের সম্বন্ধ পাতাইয়া সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে—যমনিয়মের সহস্র বন্ধনে ভিতরের নৈসর্গিক পশুটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—সংসারের যূপস্তম্ভে সেই পশুটাকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপন্থীর সহিত খ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় আশ্চর্য্য মিল আছে, আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা কিন্তু মনুষ্য জীবনকে দুইটা কুঠরিতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; একটা

secular, temporal, আর একটা religious, spiritual—এবং এই দুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। সাবেক রোমানের জীবন ছিল একটা কুঠরিতে নিবদ্ধ; খ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে। খ্রীষ্টীয়সমাজ আত্মরক্ষার জন্য রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতে গিয়া এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আজি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। ভুবন বিজয়োদ্যত ইসলামের জয়ধ্বজাকে পিরিনীসের ওপারে ঠেলিয়া দিয়া চার্লস মার্টেল খ্রীষ্টীয় সমাজকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে রোমের বাবাজী পোপ যেদিন চার্লস মার্টেলের বংশধর বড় চার্লসের—শার্লমেনের—মাথায় রোমের কাইসারের মুকুট পরাইয়া রাষ্ট্রপালের সহিত ধর্ম্মপালের একটা অস্বাভাবিক সন্ধি স্থাপন করিলেন, সেই দিন এই বিরোধের বীজ বপন হয়; উভয়ের মধ্যে সন্ধি টেকে নাই; ফলে কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে হাজার বৎসর জুড়িয়া একটা মর্ম্মগত বিরোধ খ্রীষ্টপন্থীর জীবনের এক অংশকে অন্য অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপ আজ বালক বালিকার ও বৃদ্ধ বনিতার রুধিরের হ্রদে স্নান করিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভোগমত্ত রতিকামের উপর দাঁড়াইয়া ইউরোপের সভ্যতা ছিন্নমস্তাবেশে আপনার রক্ত আপনি পান করিতেছে। ভারতবর্ষে বেদপন্থীর জীবনে এইরূপ দুইটা বিরোধী কুঠরি থাকিতে পারে না। বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা ব্যাপার, একটা যজ্ঞ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ,—কুরুক্ষেত্রের লড়াই হইতে দাঁতনকাঠির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মকে একই পর্য্যায়ে ফেলাইতে বেদপন্থী বাধ্য আছেন— ইহাতে ক্ষোভ করিলে বা উপহাস করিলে চলিবে না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির ভিতরে ধর্ম্ম আটকান আছে, বলিয়া হাসিলে চলিবে না। ফলে ইউরোপের আশ্রিত অবাধ competitionএর পরিণামই ঐরূপ ভয়ঙ্কর। আজকাল competitionএর স্থানে co-operation

বসাইবার যে ধূয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কুলাইবে না; ভিতরের পশুটা দাঁত বাহির করিবেই। চাই একবারে ষোল আনা sacrifice—যাহার অর্থ যজ্ঞ বা ত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মা চরিতার্থ হইবে; এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভেই প্রকৃত invdividualism. ভারতবর্ষে বেদপন্থীর individualismএর স্বাতন্ত্র্য এই আত্মসমর্পণে।

আপনারা পুরাণে ঋষিগণের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহু-সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবন-যাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের ব্যথা হয় নাই। তিনি কখন ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং, যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্যদান করিয়াছেন। চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন;—কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-

যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশবিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য, তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; পরপীড়নের আশঙ্কায় আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পরাইয়া বিদ্যালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবী রূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সরস্বতী রূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্তালোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। অগ্নি-পত্নী স্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মকে আহুতি রূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রপত্নী শচীরূপে তিনি সেই যজ্ঞক্রতুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই দেবমাতা অদিতি—স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাহাকে জন্ম দিয়াছেন। "অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ",—অদিতিই দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন; সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষ্ণুর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমবৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই ধূলি হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের

অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, প মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর, হবিঃশেষরূপে সেই ইড়াভোজ মাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতা সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি ;—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্—
বন্দেমাতরম্।